প্রতিদিন ২৮ জানুয়ারি ২০০৭

রবিবার

রাগ কল্লোলিনী

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

লাল্ লাল্ লাল্ বিয়ের লগন,
সাথে হলুদের শুরু এখন,
চুড়ি চুড়ি বালার মেলা,
হলুদ কোটা সকাল বেলা,

Gift Voucher 100 টাকা থেকে শুরু।

আমাদের জুয়েলারী ইন্সেনটিভ স্কিম-এর মাধ্যমে
মাসে মাসে টাকা জমিয়ে গয়না কিনুন।

আমরা G.S.I Certified গ্রহরত্ন বিক্রয় করি

www.anjali.bz

অঞ্জলি জুয়েলার্স™

গোলপার্ক ঃ ২৮এ, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২৯, ফোন ঃ ২৪৪০ ১৭৯২ / ২৪৬০ ০৫৮১
সল্টলেক ঃ বি. ই. ১০১, কোয়ালিটি মোড়, কলকাতা - ৬৪, ফোন ঃ ২৩২১ ২০৫৭ / ২৭৮৬
সল্টলেক ঃ এইচ. এ. - ৩, সেক্টর - III, GD আইল্যান্ডের পাশে, কলকাতা- ৯৭, ফোন ঃ ২৩২১ ৮৩১০ / ১১
বেহালা ঃ ৫২২সি, ডায়মন্ডহারবার রোড (স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে) কলকাতা - ৩৪, ফোন ঃ ২৪৪৫ ৫৭৮৪ / ৮৫
শোভাবাজার ঃ (নতুন শোরুম) "অঞ্জলি বাটী" ৩৮, অরবিন্দ সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৫
(শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের পাশে) ফোনঃ ২৫৩৩ ৫৮৩২ / ৫৮৩৪
এছাড়া আমাদের আর কোন শো - রুম নেই

theadventure@mail.com

রোববার

২৮ জানুয়ারি ২০০৭

ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৪

ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ৬

ত্রলেটারবক্স
পাঠকের পাতা ৯

এবার মলাট
রাগ কল্লোলিনী
অতনু চক্রবর্তী ১০

কথোপকথন
কৌশিকী চক্রবর্তী দেশিকান ১৮
সন্দীপন সমাজপতি ২০
কেয়াবাত ২২

বাংলার মুখ
পথের পাঁচালি
জয়া মিত্র ২৪

রোববার-এর মেগা
কলিকাতায় নবকুমার
সমরেশ মজুমদার ২৬

বহুবচ্চন
চলতি রহে জিন্দেগি ৩০

এখনই
গঙ্গা যদি গর্ভে টানে
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৩৪

সেন সলিউশনস
রাইমা সেন ৩৮

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ
নকুড়-এর ছানার
পায়েস ৪০

রোববার-এর
সহজপাঠ
আবার ডোডো
তাতাই
তারাপদ রায় ৪২

সৌজন্য

অভীক মুখোপাধ্যায়
অনিরুদ্ধ চাকলাদার
স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়
শ্বেতাঙ্ক তিওয়ারি
বৈশম্পায়ন সাহা
অতনু চক্রবর্তী
অঞ্জলি জুয়েলার্স
এইচএমভি

টিম রোববার

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়
অর্পিতা চৌধুরী
উৎপল চক্রবর্তী
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
শান্তনু দে
সন্দীপন মজুমদার

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

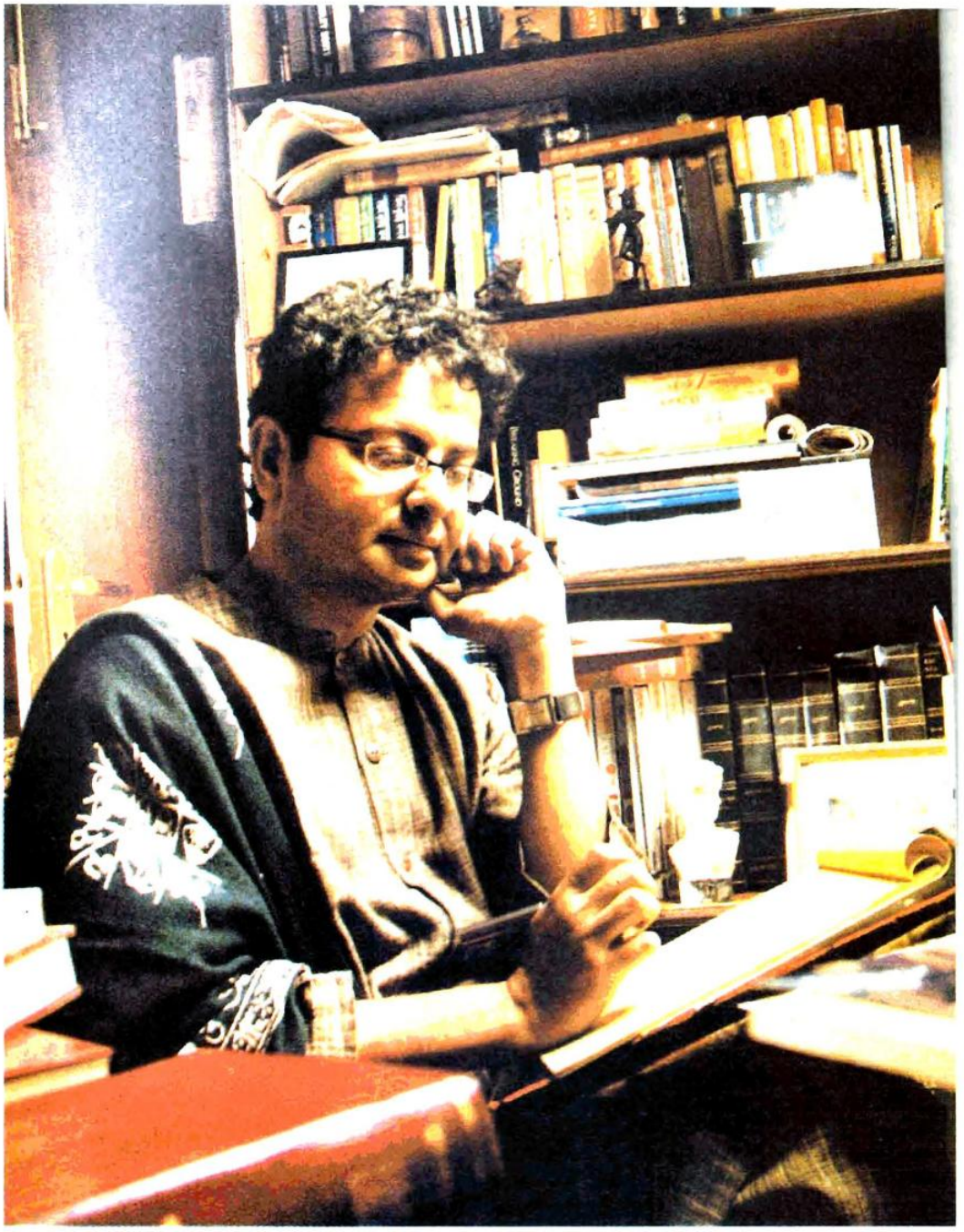

দ্বাদশবর্ষ পূর্বকার কথা।

হিন্দি চলচ্চিত্রে তখন ডিম্পল কাপাডিয়া নায়িকা হিসাবে একটি অতি সুবিদিত নাম। 'রুদালি' ছায়াছবির জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁহার অভিনেত্রী স্বত্ত্বাকে সদ্য এক অনাবিকৃত দ্যুতিতে ভূষিত করিয়াছে, আর নয়নলোভনা সুন্দরী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি তো বরাবরই অপ্রতিরোধ্য।

অতীতের নায়ক, তাঁহার পূর্বতন স্বামী, রাজেশ খান্না তাঁহার হৃদয়পটে তখন এক ভঙ্গুর স্মৃতিমাত্র। অথচ আদালতের কানুন অনুযায়ী তাঁহারা তখনও অবধি বিবাহিত দম্পতি। যে সময়কার কথা বলিতেছি, ডিম্পল তখন মুম্বইয়ের বান্দ্রাস্থ কার্টার রোডের বাটীতেই বসবাস করেন।

আমাদের সাক্ষাতের সময় পূর্ব হইতেই নির্ধারিত ছিল—সায়াহ্নে, সাড়ে ছয় ঘটিকায়। ডিম্পল তখন গোবিন্দ নিহালনির 'দৃষ্টি' ছায়াছবিতে ডাবিং কার্যে ব্যাপৃত বলিয়াছিলেন, 'ফিরতে ফিরতে ছ'টা হবে। তুমি তারপরে এসো। সাড়ে ছ'টা নাগাদ।'

সন্ধ্যা ছ'টা মুম্বইয়ের সূর্যকে ঈষৎ ক্ষণপ্রভ করিতে পারে মাত্র। মহারাষ্ট্রের গোধূলি আর পশ্চিমবঙ্গের সূর্যাস্তের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান। সন্ধ্যা ছ'টার আকাশের দিকে চাহিলে উত্তর-মধ্যাহ্নের উষ্ণ পীতাভ রৌদ্রালোক ব্যতীত কিছুই নজরে আসে না।

মুম্বইতে আমার বাসা ছিল বান্দ্রার নিকটেই কোনও একটি অতিথিশালায়। ফলে পদব্রজে এই সামান্য দূরত্ব সহজেই অতিক্রম করিলাম।

দ্বাদশ বর্ষকাল পূর্ব। তখনই মুম্বই অনেক পরিবর্তিত।

খাকি উর্দি যে কোনও সাধারণ মানুষকে যে কতখানি নিষ্ঠুর ও নৈর্ব্যক্তিক করে, অন্য পোশাক মুহূর্তে যেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে দেখাইয়া দেয়

বৈকালিক স্বর্ণাভার ক্রীকেট ক্রীড়ারত বালক নাই, রোয়াকে যুবক নাই, সমুদ্রতীরস্থ ব্যান্ডস্ট্যান্ড ভিন্ন কোথাও কোনও অবকাশকামী মানুষের সন্ধান মেলে না। মুম্বই শহর সদা ধাবমান, তথায় বিশ্রামের কোনও স্থান নাই।

ডিম্পলের বাড়িতে যখন অবশেষে পঁহুছিলাম, তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয় ঘটিকা হইবে।

বিশাল গেটের সম্মুখে দীর্ঘকায় প্রৌঢ় গৃহরক্ষী। গম্ভীর হিন্দিতে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলেন—কী আমার পরিচয়? কোথা হইতে আসিতেছি? ... ইত্যাদি।

সদ্য হয়তো নাম, এবং কলিকাতা নিবাসী এতটুকু বলিয়াছি এমন সময় একটি অতিবৃহৎ মনোহরদর্শন গাড়ি আসিয়া থামিল। ডিম্পল কার্যসমাপনান্তে গৃহে ফিরিয়াছেন।

গৃহরক্ষীর জেরা হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে গৃহ অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

ডিম্পল কাপাডিয়ার বৈঠকখানা সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত বরাবরই ডিম্পলের এক বিশেষ সুচারু অন্দরসজ্জাপ্রীতি লক্ষ করিয়াছি। কক্ষমধ্যে খ্রীস্টীয় মধ্যযুগীয় ম্যুরাল-শোভিত একটি বিশালকায় দারুনির্মিত বিভাজনখণ্ড।

বাহিরের দিকের দেওয়ালটি কাচের। তাহার মধ্য দিয়া দেখিলাম মুম্বইয়ের সাড়ে ছটার সূর্য অতীব অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে ম্লান হইতেছে।

ক্রমে দিবালোক মুমূর্ষু হইল। ব্যাঘ্র যেমন শিকারকে, এবং ব্যাধ যেমন ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে, ঠিক তেমনই অন্ধকার আসিয়া দিবসকে পরাভূত করিল।

বৈঠক খানার কাচের দেওয়ালের বাহিরের অন্তিম রবিরেখা নিকষনিমজ্জিত। কেবল কক্ষের বাতিসকল সেই অরূপ কৃষ্ণতায় দীপালোকের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে।

কাজকর্মের আলোচনা যত না হইল— তাহা হইতে অধিক হইল অলস বিশ্রম্ভালাভ। ডিম্পল কখনও মানুষ হিসাবে সতর্ক বা অতিসচেতন নহেন, ফলে আড্ডা জমিতে সময় লাগে না।

অবশেষে আটটা। এইবার উঠিতে হয়। নতুবা, গৃহস্বামিনী খানিক অনুরোধ খানিক জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া কোথাও নৈশভোজে লইয়া যাইবেন—এ সম্ভাবনা প্রবল। আর তাহা হইলে ভোজ সম্পন্ন হইতে হইতে উত্তর মধ্যরাত্রি। মুম্বইতে সূর্য বিলম্ব করিয়া ডুবিলেও, উদিত হইতে তত বিলম্ব করেন না। অতএব গুটি গুটি প্রস্থান করাই শ্রেয়।

গেটের বাহিরে তখন গৃহরক্ষী বদল হইয়াছে। অপরাহ্নের সেই দীর্ঘকায় প্রৌঢ়ের স্থানে এখন এক অন্য মানুষ।

তারকাগৃহের নিয়মই এমন। ঢুকিবার সময়ই যত জবাবদিহি করিতে হয়। বাহির হইবার সময়ে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—অন্দরের অতিথিকে তাঁহারা অতি সহাস্যে বিদায় জানাইয়া থাকেন।

গেট পার হইয়া, রক্ষীদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে করিতে নির্গত হইতেছি — কোথা হইতে আসিয়া পথরোধ করিলেন সেই দীর্ঘকায় প্রৌঢ়।

অধুনা তাঁহার রক্ষীবেশ পরিবর্তিত। খাকি উর্দি যে কোনও সাধারণ মানুষকে যে কতখানি নিষ্ঠুর ও নৈর্ব্যক্তিক করে, অন্য পোশাক মুহূর্তে যেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে দেখাইয়া দেয়।

তাঁহার পরনে এখন নীল টেরিকটনের একটি মলিন শার্ট এবং ছাইরঙা ধূসর প্যান্ট। বুঝিলাম, মানুষটি আমার নিমিত্তই অপেক্ষা করিতেছেন। অন্যদের উপস্থিতিতে সামান্য অস্বস্তি লক্ষ করিলাম। ফলে ঈষৎ ব্যবধানে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

ভদ্রলোকের ভঙ্গুর মুখ যেন এক অদ্ভুত কৃতজ্ঞ হাসিতে উজ্জ্বল হইল।

বৈকালিক জিজ্ঞাসাবাদের অসমাপ্ত জেরটুকু হইতেই যেন পুনর্সূচনা করিলেন—আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন? অপরাহ্নের শোনা উত্তরভারতীয় হিন্দিতে এবার অল্পদিনের বাংলা শেখার আত্মীয়তা। অনুমান করিলাম, ভদ্রলোক কিছুকাল হইলেও বাংলায় বসবাস করিয়াছেন।

বললাম — হ্যাঁ

ব্যাস। গৌরচন্দ্রিকা শেষ। এইবার সোজা প্রশ্ন। কণ্ঠস্বর অনেক মিহি শোনাইল।

'টিটাগড় পেপার মিল খুলেছে কিনা, জানেন?'

আরবসাগরের সূর্য ডুবিতে চাহে না বটে, কিন্তু ডুবিলে যে এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হয়— কে জানিত? কে জানিত, যে ডিম্পলের দোতলার বৈঠকখানার কাচের দেওয়ালের ভেতর আলোকিত অন্দরের প্রেক্ষাপটে সেই দীর্ঘকায় পিতা এমন অসহিষ্ণু, অধৈর্য্য হইবেন? গৃহরক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ হইতে ইহা অনেক বেশি সূচীভেদ্য, কঠিন ও নৈর্ব্যক্তিক। যেন উত্তর তাঁহার একক্ষুণি প্রয়োজন।

বলিলাম—কেন? ছেলে আছে?

নিকষ দীর্ঘদেহ অন্ধকারে অল্প একটু নড়িল।

বুঝিলাম—হ্যাঁ।

সত্য স্বীকার করিতেই হইল— জানিনা, গিয়ে খোঁজ করে জানিয়ে দিতে পারি।

আজ, এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ল সেই ঘটনাটার কথা। ডিম্পল এখন আর কার্টার রোডে থাকে না। রাজেশ খান্নার সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে জুহুতে বাস্তু বলে একটা অ্যাপার্টমেন্ট-এ উঠে গেছে। সেই লম্বা মতন ভদ্রলোক নিশ্চয়ই এখন আর নেই। কার্টার রোড-এর বাড়িটা শুনেছি নীলাম হয়ে গেছে।

ইস্! কত খবর দিতে পারতাম নইলে, বলতে পারতাম— পেপার মিল, জুটমিল বন্ধ হয়েছে তো কী হল? তোমার ছেলেকে খবর দাও। সেও তার বেকার বসে থাকা বন্ধুবান্ধবদের জানাক। সিঙ্গুরে নতুন গাড়ির ফ্যাক্টরি হবে, শালবনীতে জিন্দালের কারখানা হবে, বারুইপুরে ক্ষেত উপড়ে ফেলে বাড়ি তৈরির কাজে অনেক মিস্ত্রী লাগবে।

পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নয়ন আসছে গো!

অবশ্য এসব কারখানায় মিস্ত্রি মজুর কতটা লাগবে জানিনা। তবে, কারখানা গেটে দারোয়ান তো লাগবে!

ঋতুপর্ণ ঘোষ

নবনীতা দেবসেন

আবার এসে গেলো কলকাতাতে কিন্নর কিন্নরীদের আগমনের ঋতু। ছোটোবেলাতে সেটা আসতো পরীক্ষার পরে পরে, আশ্চর্য সব শীতল, কুয়াশা ঘেরা মধ্যরাত্রে, যে সময়ে ছোটোদের একেবারে বাইরে বেরুনো বারণ। তার ওপরে আমরা তো কন্যা সন্তান। নিষেধের নূপুর (পড়ুন, শেকল) বাজতো আমাদের পায়ে পায়ে। হ্যাঁ, তখন মজা করতো আমাদের দাদাভাই-এরা। বাবা যেতেন নিয়ম করে গান শুনতে সদারঙ্গের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের উৎসবে, মা যেতেন না। মায়ের লোক দেখনো কিছুই ছিলো না। মা শুধুই রবীন্দ্রনাথের।

যেদিন যেদিন নাচ থাকতো বাবার ধারণা ছিলো সেই সব দিনে আমার মতো ছোটোদের নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যে ছোটোরা নেহাৎ বিঘ্ন বৈ তো নয়। এমন কিছু ছোটও ছিলুমনা আমি তখন। টিনএজার হব। দোষের মধ্যে শাড়ি ধরিনি, ফ্রক পরতুম আর লুকিয়ে বেড়াতুম। সে তো এখনো বেড়াই, লাঠি হাতে হলের ভিতরে ঘুরে যেতেন তাঁদের গায়ে পারিবারিক জামেওয়ারী শাল, মুখে দামি জর্দার সুবাস, মেয়েদের পরণে মহার্ঘ শাড়ি, হিরে পান্না, বিদেশি সুরভি, যেন স্বপ্নের দেশের মানুষ সব। আর হাতে উলকাঁটা এই যা। এই সময়ে ইডেনে টেস্ট ক্রিকেটেও এঁরা যেতেন, খুব সেজেগুজে, বড় টিফিন ক্যারিয়ারভর্তি চপ কাটলেট লুচি মাংস নিয়ে। চোখে গগলস, আর হাতে উলকাঁটা। সঙ্গে স্বামী পুত্র শ্বশুরেরা। এটা ছিলো কলকাতার শীতের ইস্টাইল।

নাচের প্রোগ্রামের পরেই আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হোতো। সত্যি বলতে কী তখন আমার ধ্রুপদী নাচও তত ভালো লাগতো না। বাড়ি এসে বাঁচতাম। কিন্তু অবাক লাগতো আরেকটা কিছু। ফুটপাথে ভর্তি কম্বল মুড়ি দেওয়া মানুষ। ওরা বসে বসে মাথা নাড়াচ্ছে, জুতো নাচাচ্ছে, মাঝে মাঝে আহাহা বলে চেঁচিয়েও উঠছে, কিন্তু ওরা কারা? ওদের কাছেই যত চা-ওলা যাচ্ছে কেটলি হাতে, কম্বল মুড়ি দেওয়া লোকেরা কেউ কিন্তু শুয়ে

আমি বলতে চাই-শুধু এই পাড়ার গল্পটুকু। আমার হিরোরা (অর্থাৎ দাদার বন্ধুরা) তখন কম্বলের আর মাফলারের আড়াল থেকে হাত বের করে রাস্তাতে উত্তুরে বাতাসের শীতের প্রকোপ তাড়াতে বারবার চা খেতেন, এখনকার মতো ফ্যান্টার শিশিতে ভডকা আর কোকের বোতলে রম নিয়ে গান শুনতে যাওয়ার চল হয়নি তখনও।

আমি শুধু আমাদের টুকরো, আবছা খবরটুকু রাখি। মহাজাতি সদনে যে বিরাট করে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের আসর বসতো তার তাপউত্তাপ আমাদের স্পর্শ করতো না। সে নিয়ে পাগল হয়ে থাকতো আমার বাপের বাড়ি, ঠনঠনের বাড়ির ছেলেরা। উত্তর কলকাতাতে শীতকালে বসতো সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন বলে ছোটোমতো আরো একটি সঙ্গীত সম্মেলন। যারা গান ভালোবাসেন তারা সেটির জন্যে দিন গুনতেন। এদিকে পার্কসার্কাস ময়দানেও একটা বড়সড় সঙ্গীত সম্মেলন হোতো, সম্ভবত সদারঙ্গই ওখানে মাঠে উঠে এসেছিল। কিন্তু সেখানে কোনোদিন যাওয়া হয়নি আমার। ঠিকঠাক দল জোটাতে পারিনি। আমি শুধু ঝাপসা ঝাপসা বলতে পারি কেবল পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগের দক্ষিণ কলকাতার গল্পটার এক টুকরো। শীতকালে স্বর্গ থেকে কিন্নর কিন্নরীদের নেমে আসার গল্প।

দক্ষিণ কলকাতাতে সদারঙ্গ তখন হোতো আশুতোষ কলেজের অডিটোরিয়ামে। অডিটোরিয়াম বলতে শুধু ওটাই ছিলো এপাড়ায়। চল্লিশের দশকে আমার মা বাবার আয়োজনে সাত দিন ধরে যে রবীন্দ্র সপ্তাহ হয়েছিলো, সেও হোলো ওখানে। এই অঞ্চলে আর তো কোনো জায়গাই ছিলোনা। তার জন্যে প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে রিহার্সাল হোতো। তরুণী গোপা-হেমাঙ্গিনী নাচতেন, ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে। ঘরে যেন সত্যি সত্যি ভ্রমর উড়ে আসতো। সেই একজনের যুগ্ম নামও আমার যেমন পছন্দ ছিলো তার সেই নাচও আমার মনপছন্দের ছিলো। সেখানেই প্রথম দেখি অমিতা সেনকে, যিনি পরে আমার শ্বশ্রূমাতা হয়েছিলেন। আমার ধারণা, সেই বারেই প্রথম দেখেছিলাম কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে, স্টেজে, শুনেছিলাম তাঁর অসাধারণ কণ্ঠে কবিতাপাঠ। কিন্তু সেকথা থাক। এসব এসে পড়েছে আশুতোষ কলেজের প্রসঙ্গে। পরে আরো একটি জায়গায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসর বসেছে ভবানীপুরে, যদ্দুর মনে পড়ছে, ইন্দিরা সিনেমায়। তার সামনেও মাইক দিতো, আর অল্পবয়সীদের ভিড় হোতো ফুটপাথে, চা-ওলারা ঘুরতো। তখন এসব নেসকফির বালতির চল হয়নি। রাস্তাতে কফি, সে অনেক পরের ব্যাপার। ওতে চায়ের কেটলির (কিম্বা চায়ের কলসীর) বনেদিয়ানা নেই।

ওসব নয়, আমি বলতে চাই শুধু এই পাড়ার গল্পটুকু। আমার হিরোরা (অর্থাৎ দাদার বন্ধুরা) তখন কম্বলের আর মাফলারের আড়াল থেকে হাত বের করে রাস্তাতে উত্তুরে বাতাসের শীতের প্রকোপ তাড়াতে বারবার চা খেতেন, এখনকার মতো ফ্যান্টার শিশিতে ভডকা আর কোকের বোতলে রম নিয়ে গান শুনতে যাওয়ার চল হয়নি তখনও। তখনও গানটাই ছিলো মূল নেশা। আর মাঝে মাঝে গাঁজার গন্ধ উঠতো। শূন্য গাঁজার কলকে পড়ে থাকতো পথে, সকালবেলাতে ভাঙা চায়ের ভাঁড়ের নেই, ভিক্ষেও চাইছেনা, প্রত্যেকেই কান মাথা মুড়ি দিয়ে ফুটপাথে বসে আছে, এবং চা, পান, আর সিগারেট খাচ্ছে। এরা কেমন ধারা মানুষ গো? এদের মুখ দেখিনি চোখ দেখিনি, কান দেখেছি। আমার ভীষণ ইচ্ছে করতো ওদের সঙ্গে গিয়ে বসি একখানা কম্বল জড়িয়ে। সদারঙ্গে সেটা হয়নি, কিন্তু ডোভার লেনে সম্ভব হয়েছে। ওখানে আমার নিজের দাদারা ছিলো। কম্বলের এককোনাতে বসতে দিতো। কম্বল পার্টির মধ্যে ছিলেন এখনকার বিখ্যাত অধ্যাপকেরা যেমন প্রেসিডেন্সির দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, আইআইএমএর সত্যেশ চক্রবর্তী —এঁরা সবাই স্বীকার করেন তাঁদের সকলেরই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে হাতেখড়ি ফুটপাথে।

এরাই আমাদের দাদা-ভাই অশোক, মুকুলদাদা, প্রদীপদা, জাপুদাদা, চিন্ময়দাদা, আর তাদের কলেজের বন্ধুরা যারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পাগল, কিন্তু সদ্য কলেজে পড়ে, পকেটে শুধু পান সিগারেটের পয়সা, এবং এদের কথা মনে রেখে সদারঙ্গের, ডোভার লেনের আয়োজকেরা রাস্তাতে মাইক লাগিয়ে দিতেন।

ডোভার লেনের টিকিট। ডোভার লেনের মাঠেই প্রথম শুনেছি বড়ে গুলাম আলির গলায়, কা করু সজনী, আয়েনা বালম! অমনধারা একখানা জমকালো চেহারা থেকে যে এরকম আকুলতা বেরুনো সম্ভব, স্বচক্ষে না দেখলে, শুধুই ডিস্কে শুনলে সে ম্যাজিকটা বোঝা দুঃসাধ্য।

পাশাপাশি। অবিশ্যি ফুটপাথের ভাঁড়ে, রাতের আঁধারে বাংলা, চুল্লুর চল ছিলো কিনা আমি তখনো জানতুম না।

আমাদের পাড়াতে যখন ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স হোলো, সিংঘি পার্কের ফাঁকা মাঠটাতে ম্যারাপ বেঁধে, তখনও আমাদের টিকিটিও কিনে ভিতরে ঢোকবার সামর্থ্য হয়নি। অথচ হৈ চৈ করার উৎসাহ আছে প্রচুর। মার্গসঙ্গীতকে ভালোবাসিনা, কিন্তু সারারাত অত লোকজন, রাস্তায় রাতভোর অমন জেগে থাকাথাকি, অত অল্পবয়সী তরুণদের আনাগোনা, আমার ডোভার লেনের প্রতি আবিল করুণ অবস্থা। আগ্রহ মোর অসীম অতি কোথা সে রজনী সঙ্গীতবতী। মনে রাখা দরকার তখন পুজোর সময়ে এই, 'লে হালুয়া পইসাপুয়া' স্টাইলের ছেলে মেয়েদের হোল নাইট ঘোরাঘুরির চল হয়নি। এমত পারমিসিভ সমাজের টিকিটও দৃশ্যমান হয়নি তখন। হায়! এই মিউজিক কনফারেন্সগুলিতেই ছিলো নিশীথরাতে চেনা অচেনা তরুণ তরুণীর মেলামেশার যৎসামান্য সুযোগ। একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি। দূর থেকে দেখা, একটু চোখাচোখি, হয়তো দুটো কথা. তাই নিয়ে দিনের পরে দিন, রাতের পরে রাত। হয়তো নামটাই জানা হোলো না। কিম্বা লোক মারফতে নাম পরিচয় জানতে জানতে কনফারেন্স শেষ, পরের বছরের জন্য হাপিত্যেশ অপেক্ষা।

হবে তো? দেখা হবে তো? হ্যাঁ আমাদের সময়ে এরকমটাই ছিলো হৃদয়ের দম। ঐ পরপর কয়েক বছরের সুরের সাগরে অবগাহনের ফাঁকে মৃদু মধুর পরিচয়ে সংসারও পেতে ফেলেছে আমার চেনা মানুষের কেউ কেউ। একবার আমার মামা আমাকে আদর করে দারুণ একটা উপহার দিলেন। ডোভার লেনের টিকিট। ডোভার লেনের মাঠেই প্রথম শুনেছি বড়ে গুলাম আলির গলায়, কা করু সজনী, আয়েনা বালম! অমনধারা একখানা জমকালো চেহারা থেকে যে এরকম আকুলতা বেরুনো সম্ভব, স্বচক্ষে না দেখলে, শুধুই ডিস্কে শুনলে সে ম্যাজিকটা বোঝা দুঃসাধ্য। এরকম আরেকটা অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা হয়েছিলো ফার্ন রোড সঙ্গীত সম্মেলনে। সে সম্মেলন কবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অমন সরু গলির মধ্যে এমন চওড়া সব শিল্পীদের আনাগোনা ছিলো। গড়িয়াহাট মার্কেট বড় হয়ে গেল, ফার্ন রোডের মাঠ গ্রাস করে নিল। একবার শুনছি অসামান্য এক নবীন গায়ক আসছেন কলকাতাতে, এই নতুন. কিন্তু ভীষণ দেরি হচ্ছে গাইয়েকে মঞ্চে আনাই গেলনা। শেষে এক মত্ত যুবক এসে স্টেজে বসে পড়লেন। তার পরে নাভি ভেদ করে বেরিয়ে এলো, গম গম করে এক প্রার্থনা, যো ভজে হরিকো সদা—সেই আমার প্রথম ভীমসেন যোশীকে দেখা এবং শোনা, এবং মুগ্ধতা। ওখানেই প্রথম দেখি রওশনকুমারীর নাচ। মনে হয়েছিলো শিল্পীদের তুলনায় সেদিনের মঞ্চটির এবং সভাক্ষেত্রের যথেষ্ট ব্যাপ্তি ছিলো না। কিন্তু শিল্পীদের সে নিয়ে কোনো অশান্তি করতে দেখিনি, ইদানীং যে ঘটনাটি প্রায়শই শোনা যায়। কেউ আর মনে রাখছিনা আমরা, আমরা যে অমৃতের সন্তান।

পরে ডোভার লেনের মার্গসঙ্গীতের অনুষ্ঠান উদ্বাস্তু হয়ে পড়লো। মাঝে কিছুকাল সত্তরের দশকে হিন্দুস্থান পার্কের এক মাঠে অনুষ্ঠিত হত। আমি একটি দামি টিকিট কিনে আমার দুই মেয়ে আর দুই ছাত্তরকে নিয়ে হাজির হতুম। যদি হও সুজন, এক টিকিটে পাঁচজন। প্রথম দিকে ছোটোদের পাঠাতুম, একা একা, মহানন্দে মহাগৌরবে তারা শুনে আসতো, নাচও দেখে আসতো। একজন ফিরলে পরে আরেকজনের গান শুনতে যাবার পালা। মহা আহ্লাদে, মহা উত্তেজনাতে আমাদের সেই অন্তহীন যাওয়া আসা। টিকিট নিয়েও যেন বিনা টিকিটে যাবার মতো নিষিদ্ধ বিলাস।

আমার ছোটো নীল ফিয়াটে আমরা বাকিরা বসে থাকতুম, আড্ডা মারতুম। ফ্লাস্কে কফি আর থামসাপ-এর বোতল, বিস্কুটের কৌটো, চকোলেট, কখনো মায়ের দেওয়া মাছের চপ, লুচি তরকারি, ক্রিসমাস কেক, নলেন গুড়ের সন্দেশ— এইসব রসদ থাকতো। একটু করে গান শুনে আসা আর একটু করে টিফিন খাওয়া হোতো ছোটোদের। তবু আমি চেয়েছিলুম আমার বাচ্চাদের রুচি তৈরি হোক। কান তৈরি হোক। শাড়ি গয়না শালের প্রদর্শনীর জন্য নয়, ওরা দেখুক, ভারতবর্ষের প্রাণকে চিনুক, ভালোবাসুক। সহজ শিকড় নাকি আমাদের এই প্রতিদিনের খেয়োখেয়ি করে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া, নিত্য আত্মবিস্মৃত এই পরম দুঃখী দেশটার? এত যে সাম্প্রদায়িকতা, এমন অসামান্য মার্গসঙ্গীত কোথা থেকে পেতুম আমরা, ভারতবর্ষের আকাশ মাটিতে হিন্দু মুসলমানের অন্তরাত্মার মিলন না ঘটলে? ধর্ম নিরপেক্ষতার আর এর চেয়ে বড় কোন সাক্ষী আছে?

আবার এসেছে সেই কিন্নর কিন্নরীদের সময়, আবার বসবে মার্গসঙ্গীতের আসর, আবার যাবেন সেই একই মানুষগুলো গত পঞ্চাশ বছর ধরে যাঁরা যাচ্ছেন, কেউ কেউ এখন হুইলচেয়ারে, তবু যাবেন। এটা তাদের অ্যানুয়াল রিচুয়াল। প্রত্যেক শীতে কয়েকটি মুখ হারিয়ে যায়। সুর কিন্তু ঠিকই বেজে চলে। আমার অহংকারে বুক গুরগুর করে ওঠে, যখনই একটু তলিয়ে ভাবি। হিন্দুস্থান পার্কের পরে বিবেকানন্দ পার্ক, তারপরে নজরুল মঞ্চ ভর্তি হয়ে থাকে বিপুল শ্রোতায়। সবই ভালো, শুধু আমার আপত্তি, সারা রাত্রি বড্ড লাইন দিয়ে বিরিয়ানি খায় ওখানে লোকেরা। পারে কী করে? পানীয়ের কথা থাক।

সারা পৃথিবীর আর কোন দেশেতে এমন সব রাগ রাগিনী আছেন গো? যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস পড়বে তার প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে ঠিক রাগ রাগিনীরা কেউ না কেউ তোমার হাতটি ধরে আছেন। রাগেরা তো আছেনই আবার রাগিনী! আহাহা।

আর এমনসব সাধক শিল্পীরা? আমাদের কী সৌভাগ্য!

হাতের কাছে, কোলের কাছে পাই কি না, তাই চিনতেও পারিনে কত বিশাল একটা বৈভবের, অসীম ধনঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার পেয়েছি আমরা।

যতই বিশ্বায়ন হোক ফিউশন হোক, এই একটা জিনিস বিশ্বের কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, আমাদের সঙ্গে আগে হাতে হাত, বুকে বুক না মিশিয়ে দিয়ে।

যো ভজে হরিকো সদা।

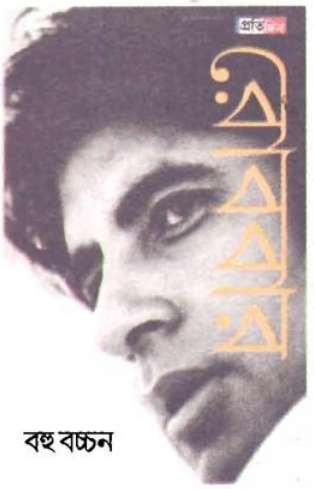

(১)

আমি হ্যাংলা পত্রলেখক। কবে, কখন নতুন পত্র-পত্রিকা বেরোচ্ছে সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। নতুনকে পাব বলে। চেখে দেখব বলে। হাতে পেলেই খুঁটিনাটি দেখি। ওল্টাই। কেমন লাগল জানাই। ছাপাও হয়। খবরের খবরদারির ফলাফল।

সংবাদ প্রতিদিন-এর রোববার বেরোচ্ছে খবর দেখেই চোখ রেখেছি। অবশেষে ২৪ ডিসেম্বর দেখলাম স্বপ্নসাধের রোববার। মনে হয় বাংলা সংবাদপত্র জগতে এমন রোববার নিশ্চয়ই নতুনত্বের সংযোজন। ইতিপূর্বের পাতা ওল্টালে জুড়ি মেলা ভার।

যাইহোক, সম্পাদক মহাশয়, রোববার জুড়ি মেলা ভার। মাতাবার মতো সবরকম মনমজানো উপহার তুলে দিয়েছেন পাঠকসমাজের হাতে। অজস্র ধন্যবাদ জানাই তাঁর এই অভিনব প্রয়াসকে। সবদিকেই সব কিছুতেই হাল্কা মেজাজের ঘোরাঘুরি। উগ্র-আধুনিকতার স্পর্শ নেই। পাতার পর পাতা ওল্টানো আর অবাক বিস্ময়। এমনকী, বিজ্ঞাপনের ভাষাও রবিবারের মেজাজে মজানো। হ্যাংলা পত্রলেখকের আরও কিছু লেখা বাতুলতা মাত্র।

আমার বিনীত আবেদন, পাঠকের চিঠি বিষয়বস্তুর ছবি-সহ প্রকাশ করুন। নবীনদের সুযোগ দিন। রোববার হোক খুশির রোববার। আর হাসির রোববারও চাই।

তুলসী দাস দে
বৌবাজার

(২)

গত রবিবার আপনার সম্পাদনায় সুন্দর একটা বই পেলাম। ভীষণ ভালো লেগেছে। সব ঠিক আছে। শুধু রেল আর বিমান সংস্থার একটা টাইম টেবিল থাকলে খুব ভাল হয়। একটু ভেবে দেখবেন।

সোমনাথ ঘোষাল
হরেকৃষ্ণ ঘোষ লেন, কলকাতা

(৩)

'বহু বচ্চন' এর পর 'শালতামামি'ও খুব ভাল লাগল। দুটো সংখ্যাই সংগ্রহে রেখে দেওয়ার মতো। শালতামামিতে গুরুসদয় দত্তর অপ্রকাশিত রচনা খুব সুখপাঠ্য। আশাকরি, এরকম দুর্লভ লেখা পরে আরও পাব। এ ছাড়া পড়তে ভাল লেগেছে 'শালের যক্ষ'। সঞ্জিত চৌধুরির প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা রবিবার-এর দুপুর জমিয়ে দিল।

খুশি হয়েছি রান্নার পাতা পেয়ে। প্রতি সংখ্যায় পাব তো? তবে প্রতিবার যদি ব্ল্যাকফরেস্ট -এর মতো দামি খাবারের রেসিপি দেন তবে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত গৃহিণীর পক্ষে মুশকিল। কলকাতায় অনেক পুরনো রেস্তোরাঁয় মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে খাবার পাওয়া যায়, তাদের সব কথা হয়তো আমরা জানিও না। আপনারা সেইসব হারিয়ে যাওয়া রেস্তোরাঁকে তুলে ধরুন। উপকৃত হবে পরবর্তী প্রজন্ম। তারা অন্তত এইটুকু জানবে যে

'পিৎজা হাট' আর 'ম্যাকডোনাল্ডস' ছাড়াও ভাল খাবার পাওয়া যায়।

নবনীতা দেবসেনের লেখা এককথায় অসাধারণ। আর আমার ছয় বছরের মেয়ে তো একেবারে ডোডাবাবু তাতাইবাবুর ফ্যান হয়ে গিয়েছে। তবে আমার পতিদেবের মৃদু অনুযোগ খেলাধূলা নিয়ে তো কিছুই নেই। প্লিজ, একটু ভেবে দেখবেন।

একটা চিঠিতে তিনজনের দাবি জানিয়ে ফেললাম। বাতুলতা হয়ে যায়নি তো?

নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়
টালিগঞ্জ

(৪)

রোববার-এ রাশিফলের প্রবেশ নিষেধ দেখে খুব ভাল লাগল। আপনার কাছে একান্ত অনুরোধ, রাশিফল, রেইকি, ফেং শুই— এইসব থেকে রোববারকে মুক্ত রাখুন।

প্রথম দুটো সংখ্যা দেখে মনে হয়েছে রোববার আর পাঁচটা ম্যাগাজিন থেকে আলাদা। আশা রাখি, আপনার সম্পাদনায় রোববার-এর এই স্বকীয়তা বরাবর বজায় থাকবে।

পথচলতি অন্যান্য ম্যাগাজিনের পাঠকমহল যেন অলিখিতভাবে ঠিক করে দেওয়া আছে। কোনওটা মহিলাদের জন্য, বা 'ঝিনচ্যাক' টিনএজারদের। সেখানে রোববার সব্বার। এই পত্রিকার পাঠক হতে গেলে পেরোতে হবে না কোনও লক্ষণরেখা। এরকম একটা পত্রিকার সত্যি প্রয়োজন ছিল। আপনাদের এই বিরল ও সাহসী প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

রোববার-এর প্রচ্ছদকাহিনিও প্রশংসার দাবি রাখে। শাহেনশা থেকে শাল—অবাধ বিচরণকেন্দ্র। রোববার কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পত্রিকায় ভ্রমণ কাহিনি পড়তে চাই। পেতে চাই নানা বিষয়ের উপর পার্শ্বরচনা। সঙ্গে নানা গুণিজনের সাক্ষাৎকার থাকলে ভাল লাগবে।

প্রকাশ গুহ
বিবেকানন্দ রোড

পুনশ্চ : রোববার আমার ছোটবেলাকে ফিরিয়ে এনেছে। ডোডো তাতাইকে প্রকাশ করার জন্য, বলতেই হয় রোববার যুগ যুগ জিও।

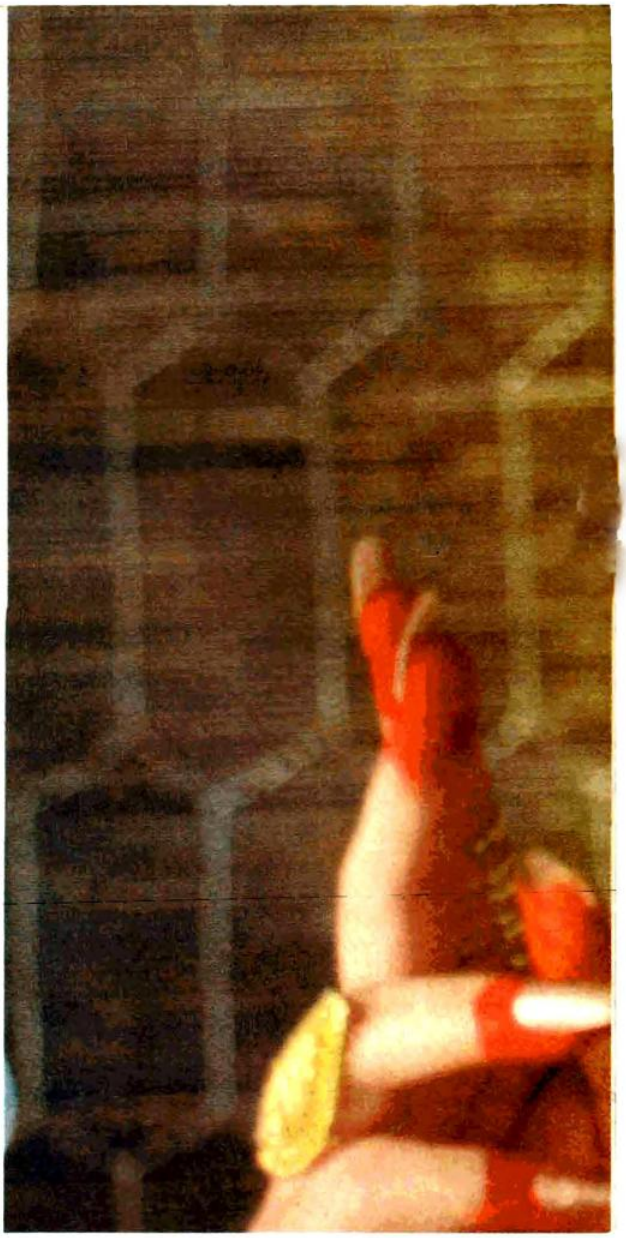

রাগ কল্লোলিনী

মঞ্চের মাঝখানে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, দুপাশে দুই প্রিয় শিষ্য—রবিশঙ্কর, আলি আকবর। এমন ত্রিবেণী সম্মেলনের ছবি দেখে বেড়ে উঠেছেন কলকাতার সমঝদার শ্রোতার দল। রাগ কল্লোলিনীর সেই সুদিন গেছে। রেওয়াজের চেয়ে এখন আওয়াজ বেশি, সাধনা অর্জনের চেয়ে সাধনার বিজ্ঞাপনচিত্র উপার্জন বাড়ায় বহুগুণ। কল্লোলিনীর বুকে, আকাশরেখায় একা ডোভার লেনই এখন শিবরাত্রির সলতে। লিখছেন অতনু চক্রবর্তী

ঠিক কুড়ি বছর আগে ঘটেছিল সেই ইন্দ্রপতন। চব্বিশে জানুয়ারি ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সের মঞ্চে শেষবারের মতো সুর তুলেছিলেন সেতারের 'তৃতীয় সম্রাট' নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যরাতে 'দরবারী কানাড়ার' সেই সুরমূর্ছনার রেশ শ্রোতার মনে মলিন হওয়ার আগেই সন্তাপে জানুয়ারি ছিঁড়ে গিয়েছিল নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবীণার তার। সেই থেকে প্রতিবছর ডোভার লেনের রাগসঙ্গীতের আসর ফিরিয়ে আনে বিষণ্ণতার স্মৃতি।

শীতের কলকাতার মাইফেল নিয়ে এমন বিষণ্ণতার পাশাপাশি, রসিক শ্রোতার মনে রাগমালার মতো উঠে আসে একের পর এক সুরেলা স্মৃতি। বর্তমান ক্যানভাস যত বিবর্ণ হয়ে যায়, ততটাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অতীত জলসার জলছবি। অদূর থেকে সুদূর অতীত—নানা বয়সের শ্রোতাকে উদ্বেল করে নানারকম স্মৃতি। কারও স্মৃতিতে উঁকি দেয় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রবিশঙ্কর-আলি আকবর যুগলবন্দির প্রসঙ্গ। কেউ হয়তো কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে সরকারি উদ্যোগের সঙ্গীত

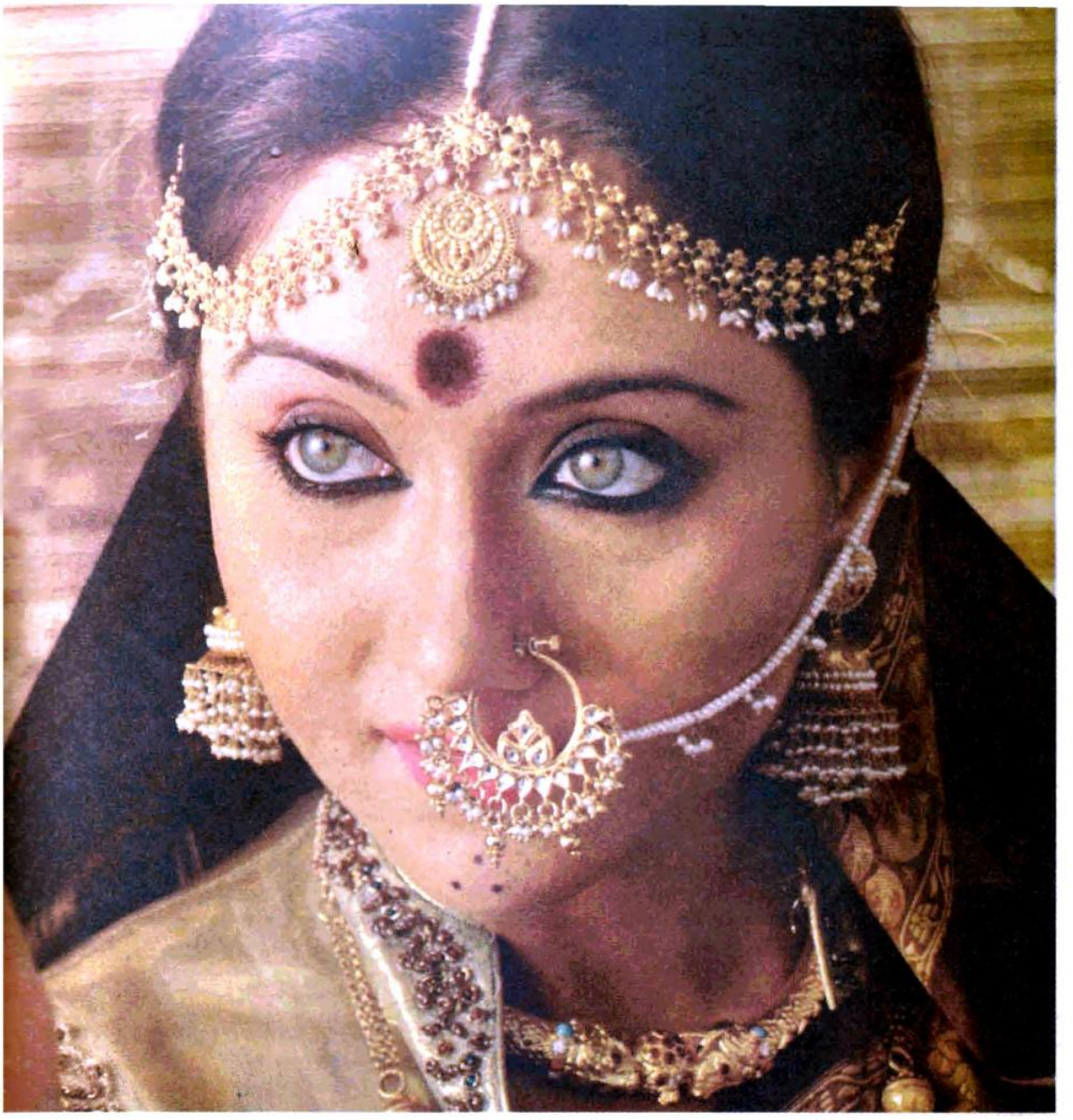

সম্মেলনের উচ্ছ্বাসী অভিজ্ঞতা তুলে আনবেন। কেউ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দরবার হলে রবিশঙ্করের একক বাদনের বর্ণনায় ব্যস্ত হবেন এভাবেই কেউ মার্বেল প্যালেস বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবিশঙ্কর-কিষেণ মহারাজ, সায়েন্স সিটিতে আমজাদ-জাকির, নজরুল মঞ্চে ভীমসেন যোশি, কলামন্দিরে কিশোরী আমোনকর, রবীন্দ্রসদনে সুনন্দা পট্টনায়েক, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গানবাজনার স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসবেন।

আরও প্রবীন শ্রোতার হয়তো মনে পড়বে আমীর খানের বিশাল ক্যানভাসে সুরের ছবি আঁকা, বড়ে গুলাম আলি খানের বিস্ময়কর মুন্সিয়ানার কথা— তানসেন, সদারঙ্গ, পার্ক সার্কাস, সুরদাস, সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজের সম্মেলনে সেকালের দিকপাল শিল্পীদের কৃতিত্বের নজির।

এভাবে স্মৃতির সরণি ধরে পিছিয়ে যেতে যেতে পৌঁছে যেতে হবে উনিশশো চৌত্রিশ সালের সাতাশে ডিসেম্বরের সেনেট হলে। সেদিন বিকেল চারটেয়, সম্মেলক জাতীয় সঙ্গীতের মাঙ্গলিক শেষে, মঞ্চে বঙ্গসংস্কৃতির শীর্ষতম আলোকস্তম্ভ রবীন্দ্রনাথের ভাষণের হাত ধরে কলকাতার প্রথম শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনের সূচনা হয়েছিল। প্রধানত সঙ্গীতানুরাগী পৃষ্ঠপোষক পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ওই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স, সঙ্গে ছিলেন প্রণবেশচন্দ্র সিংহ, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাটোররাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়ের মতো সেদিনের এলিট ব্যক্তিত্ব।

আঠাশ বছরের যুবক কুমার শচীনদেব বর্মন ছিলেন সেই সঙ্গীত সম্মেলনের প্রথম শিল্পী। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, আলাউদ্দিন খান, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ফৈয়াজ খানের মতো শিল্পীদের উপস্থিতিতে স্মরণীয় হয়েছিল বঙ্গদেশের সেই প্রথম ধ্রুপদী সঙ্গীত সম্মেলন। ওই সম্মেলনে, বালা সরস্বতীর নৃত্যশৈলিতে মুগ্ধ উদয়শংকর স্বর্ণপদক উপহার দেন বালাকে। সেই অনুষ্ঠান থেকেই বালা সরস্বতীর খ্যাতি

রবিশঙ্কর

'দেশে সঙ্গীত প্রতিভার অনটন নেই অথচ গত দশকেও যারা ছিলেন আসরের শিরোনাম আজও তারাই রয়ে গেছেন। মুষ্টিমেয় কিছু শিল্পীর উপর নির্ভরশীলতার ফলে সঙ্গীত সম্মেলন মহিমা হারাচ্ছে। না হলে শ্রোতার সংখ্যা বেড়েছে বিচার-বিবেচনার আগ্রহও বাড়েনি, এমন নয়। যদিও চারদিকে এত উন্মাদনার হাতছানি, যে এর ভিতর থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীতে মগ্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটা কঠিন।'

ছড়িয়ে পড়ে। চোদ্দ বছরের তরুণ সত্যজিৎ রায়, বালার নাচ দেখে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে চল্লিশ বছর পরে ওই নৃত্যশিল্পীকে নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণে উদ্যোগী সত্যজিৎ বলেছিলেন—'আজও আমার মনে তাজা রয়েছে, সেই স্মৃতি। সে এমন নাচ, যাতে নারীর অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে।' সেই সঙ্গীত সম্মেলনের পাশাপাশি ছিল সঙ্গীত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন প্রতিভা সন্ধানের উদ্যোগ, ছিল সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনাচক্র এবং শ্রোতা-শিল্পী-তাত্ত্বিকদের মত বিনিময়ের সুযোগ। সবমিলিয়ে 'সম্মেলন' কথাটি হয়ে উঠেছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

সময় সরণি ধরে আর আরও পিছিয়ে গিয়ে বঙ্গদেশের রইস সঙ্গীতানুরাগীদের বাড়ির বৈঠকখানা বা জলসাঘরে উঁকি দিয়ে দেখা যাবে সেকালের ওস্তাদদের গানবাজনা, বাঈজি নাচ কিংবা ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীর মতো মিউজিক সার্কলের ঘনিষ্ঠ অনুষ্ঠান অথবা গুণী শিল্পীদের স্মৃতিতে আয়োজিত সঙ্গীতবাসরের জলছবি।

লালচাঁদ বড়ালের স্মরণে আয়োজিত এমনই এক সারারাত্তিরের মাইফেল রেডিও থেকে রিলে করা হচ্ছিল। রেডিও থেকে সে আসরে মোস্তাবিবাঈ-এর গান শুনে জোড়াসাঁকো থেকে রবীন্দ্রনাথের ফোন এল রাইচাঁদ বড়ালের কাছে—'কোন গন্ধর্ব লোক থেকে নিয়ে এলে এমন শিল্পীকে?' রাইচাঁদ পরবর্তীকালে মোস্তারীবাঈকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়ে গুরুদেবের সামনে হাজির করবার উদ্যোগও নিয়েছিলেন, তবে তা অন্য প্রসঙ্গ।

এভাবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে ঢুকে পড়তে হবে ইতিহাসের গর্ভে, দরবারী কালচারে, তাই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের মাইলফলক পেছনে রেখে দ্রুত চলে আসা যাক বর্তমানে।

কলকাতার দ্বিতীয় মেজর মিউজিক কনফারেন্স দামোদর দাস খান্না আয়োজিত অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স। সেই প্রথম কর্পোরেট ছোঁয়া লাগলো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলনের গায়ে। এ বছর অমুক একমাত্র আমাদের পত্রিকাতেই উপন্যাস লিখছেন— একুশ শতকের এই শারদীয় সংখ্যার বিজ্ঞাপন ষাট বছর আগে বাস্তবায়িত করেছিলেন দামোদরদাস শর্মা! তিনি শিল্পীদের 'এক্সক্লুসিভ' হিসেবে 'বুক' করতেন। তারা অন্য কোথাও গানবাজনা করতে পারতেন না। টিকিটের দাম ছিল চড়া, সব শিল্পীর প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরকে গ্ল্যামারাইজ করার সেই শুরু। একসঙ্গে পাঁচজন শিল্পীকে স্টেজে বসিয়ে চমক দেওয়ার ক্ষেত্রেও অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সই প্রথম উদ্যোগী।

সে যুগে প্রায় প্রতিটি বড় আসরে দেশের দিকপাল শিল্পীদের উপস্থিতি থাকলেও এক একটি বছর বিশেষভাবে চিহ্নিত হতো। প্রথম বছর অল বেঙ্গলে রবীন্দ্রনাথের মহিমাময় উপস্থিতির সঙ্গে ছিলেন ফৈয়াজ খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, বাল্য সরস্বতী। সাঁইত্রিশ সালে আবদুল করিম খাঁ হয়ে উঠলেন চাঞ্চল্যের কেন্দ্রবিন্দু, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সেদিনের উপচে পড়া ভিড়ে দোতলার রেলিং ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল! ওই আসরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী বাংলার ঝাণ্ডা উঁচু করে তুলে ধরেছিলেন, যার সাক্ষী ছিলেন করিম খাঁ। আটত্রিশ-উনচল্লিশ সালের সঙ্গীত সম্মেলনে মাস্টার বিলায়েতের অভিষেকের সাক্ষী ছিল কলকাতা। বিয়াল্লিশ সালে মাস্টার কুমার গন্ধর্ব প্রথম এসেছিলেন এ শহরে। আটত্রিশ সালের কলকাতার সঙ্গীতে সম্মেলন মাতিয়েছিলেন হীরাবাঈ বরোদেকর এবং কেশরীবাঈ কেরকর। এভাবেই বড়ে গুলাম আলি খানের প্রথম অনুষ্ঠান, রবিশঙ্কর-আলি আকবরের প্রথম যুগলবন্দি, তারাপদ চক্রবর্তীর গান কলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনের এক একটি অধিবেশনের দ্যুতিময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। বহিরাগত শিল্পীদের পাশাপাশি এইসব আসরে স্বমহিমায় উপস্থিত থাকতেন বাংলার শিল্পীরা। শিল্পীদের পারস্পরিক ভাব আদানপ্রদানেও ছিল এইসব সঙ্গীত সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। দেশের নানা প্রান্তের দিকপাল শিল্পীরা কলকাতায় সঙ্গীত সম্মেলন থেকে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। অনেকেই কলকাতায় অস্থায়ী আস্তানায় থেকে একাধিক সঙ্গীতের আসর, ঘরোয়া মাইফেলে অংশ নিতেন স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও, অনেকে নিয়েছেন অগ্রণী ভূমিকা।

কলকাতা তখন সঙ্গীতশিল্পীদের কাছে ছিল প্রায় তীর্থক্ষেত্রের মতো, এখানে গানবাজনা শুনিয়ে স্বীকৃতি আদায় করতে পারা ছিল শিল্পীদের কাছে অ্যাসিড টেস্ট। কলকাতার শ্রোতাদের সমঝদারিকে উঁচু আসন দিতেন বহিরাগত শিল্পীরা।

শ্রী-উত্তরা-পূরবী প্রেক্ষাগৃহ বা গ্রেস সিনেমার সামনে কনফারেন্সে ঢুকতে না পারা অসংখ্য শ্রোতা পথের ওপর কাগজ বিছিয়ে হিম ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে সারারাত সঙ্গীতের উত্তাপ নিতেন। এদের জন্য প্রেক্ষাগৃহের বাইরে স্পিকার রাখা হত। ট্রামলাইনে কাগজ পেতে সারারাত বসে থাকা গানপাগল শ্রোতাদের গল্প; 'মিথ' হয়ে গেছে। ধ্রুপদী সঙ্গীতের আসর নিয়ে এই উন্মাদনা ছয়ের দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ততদিনে শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পরিচালনায় তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন, কালিদাস সান্যালের সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন, স্বদেশ সান্যালের সুরদাস, সতীন সেনের পার্ক সার্কাস সঙ্গীত সম্মেলন, সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন ছাড়াও এখানে ওখানে সঙ্গীতপ্রেমী উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় প্রায় একইরকম উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতবাসর বসেছে। পাশাপাশি, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে 'ঝংকার মিউজিক সার্কল', কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিজয় কিচলু প্রমুখের উদ্যোগে ক্যালকাটা মিউজিক কনফারেন্সের মতো 'সার্কল' আয়োজিত অনুষ্ঠানও কলকাতার সঙ্গীত সম্মেলনের ঐতিহ্যকে নানাভাবে পুষ্টি দিয়েছে। পার্ক সার্কাস, এন্টালি, বেলেঘাটা, মধ্য কলকাতা, জলসাঘর, কলাসঙ্গম এমন আরও অনেক সঙ্গীত সম্মেলন এই শহরের মিউজিকালচারকে সমৃদ্ধ করেছে, কোনওটি দু-দশক চলেছে মহাসমারোহে, কোনওটি অনেকদিন চলার পর বন্ধ হয়ে গেছে, রয়ে গেছে তাদের [illegible] সঙ্গীতের স্মৃতি।

শহরের বাইরেও শ্রীরামপুর বা উত্তরপাড়া সঙ্গীত সম্মেলনের মতো বহু উদ্যোগ, সঙ্গীত সম্মেলনের ঐতিহ্যের [illegible] এর মধ্যে [illegible] হয়ে আছে ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স, যা পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে [illegible] শহরের [illegible] সঙ্গীত সম্মেলন হিসেবে [illegible] সঙ্গীত সম্মেলনের পটভূমিতে উনিশশো বাহান্ন সালে শুরু হয়েছিল ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স। [illegible] আকস্মিকভাবেই ঘটেছিল এই উদ্যোগ। তিনদিনের বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রথম দিনে নাটক, দ্বিতীয় দিনে আধুনিক গানের আসরের পাশাপাশি তৃতীয় দিনে 'ক্লাসিকাল করলে কেমন হয়' ভাবনা থেকে আলাউদ্দিন খাঁ কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। আলাউদ্দিন মঞ্চে বসেছিলেন

আলি আকবর খান

'আগের দিনে মাইফেলে উদ্যোক্তা-শিল্পী-শ্রোতা সবার মিলিত উদ্যোগে উৎসাহিত হওয়ার মতো পরিবেশ গড়ে উঠত। সেই অনুরাগে ঘাটতি পড়েছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধায় টান পড়েছে। আগেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটা কিছু করে দেখানোর জেদ ছিল। আজকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আসরে বসা নিয়ে, পাবলিসিটি পাওয়া নিয়ে, শিল্পীদের ওঠানো-নামানো নিয়ে। তাই সঙ্গীত সম্মেলনের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। শ্রোতার মনে প্রশান্তি দেবার বদলে উত্তেজিত করার দায় চাপছে সঙ্গীতের উপর। আড়ম্বর বাড়ছে, কমছে গভীরতা।'

সেতারের 'তৃতীয় সম্রাট', নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গতে শান্তাপ্রসাদ

দুপাশে রবিশঙ্কর এবং আলি আকবর সেইসঙ্গে আশিস ও ধ্যানেশ খাঁকে নিয়ে। তিন পুরুষের সম্মেলক এই বাজনায় সহযোগী ছিলেন তবলিয়া অনোখেলাল এবং আহমেদজান থেরাকুয়া। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ ডোভার লেনের উদ্যোক্তারা পরের বছর থেকে তিনদিনই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসান। কালক্রমে তা আটদিনে পৌঁছেছিল। আপাতত, ডোভার লেনের সারারাত্তিরের বা মধ্যরাত পর্যন্ত আসর, শহরের সবচেয়ে জৌলুসপূর্ণ রাগসঙ্গীতের জলসা হিসেবে কুলীন গোত্রের।

ডোভার লেনের জলসায় শিল্পীতালিকা অন্যান্য বড় আসরের হলেও এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল খোলা মাঠে ছাউনি দিয়ে মঞ্চ তৈরি, যাতে একসঙ্গে বহু শ্রোতার স্থান সঙ্কুলান সম্ভব। ডোভারলেনের গ্যারেজ থেকে বিবেকানন্দ পার্ক হয়ে এই সম্মেলন নজরুল মঞ্চে পৌঁছেছে।

তিপ্পান্ন সালে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স বন্ধ হয়ে যায় বরাবরের মতো (এই নামে আর একটি সঙ্গীত সম্মেলন শুরু হয়েছে গতবছর থেকে)। এরপর বন্ধ হয় অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স। গত শতকেই একে একে বন্ধ হয়ে গেছে তানসেন, সদারঙ্গ, সুরদাস, পার্কসার্কাসের মতো বিশিষ্ট সঙ্গীত সম্মেলন। এর ভেতর থেকে মাস্তুল তুলে রেখেছে একা ডোভার লেন। আর পাশাপাশি এই শহর পেয়েছে সরকারি উদ্যোগের সঙ্গীত সম্মেলন, শিল্পসংস্থার পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত আইটিসি সঙ্গীত সম্মেলন এবং সেবামূলক ধর্মীয় সংগঠন রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত বিবেকানন্দর জন্মদিনে, চারপ্রহরব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলন। পাশাপাশি সল্টলেক, গুণীদাস এমন কিছু সাংস্কৃতিক সংস্থা বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসেবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসাতে উদ্যোগী হয়েছে। সবমিলিয়ে বয়ে চলেছে এই ধারা। এবং আশ্চর্য হওয়ার মতোই ঘটনা, আজকের অনেক তারকা শিল্পীদের প্রথম অনুষ্ঠান

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

'আজকের ক্ল্যাসিকাল কনফারেন্সে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার মানসিকতা বেড়ে চলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি শিল্পীদের মধ্যে শ্রোতাদের সহজে খুশি করার প্রবণতা। পরের জলসায় ডাক পাওয়ার জন্য, সোজা কথায় অর্থের জন্য, ক্রমাগত কম্প্রোমাইজ চলছে, ঠকছে শ্রোতারা। গড়ে উঠছে না ভাল শ্রোতা। তৈরি হওয়ার আগেই আসরে বসবার পথ খোঁজ শুরু হয়ে যাচ্ছে শিল্পীদের। মগ্ন শিল্পী রাগরাগিনীর স্বরূপ তুলে আনবে, সমঝদার শ্রোতা গানবাজনায় ডুবে রস নেবে, শিল্পীকে উৎসাহিত করবে— এ সব না হলে মাইফেলে রইল কী?'

যেখানে হয়েছিল, সেই শিশু সঙ্গীত সম্মেলন, উনিশশো চৌষট্টি সাল থেকে আজ পর্যন্ত চালিয়ে আসছেন পাথুরিয়াঘাটার সুনীলকৃষ্ণ ঘোষ।

আজকের সঙ্গীত সম্মেলন নিয়ে প্রবীণেরা হতাশ, কিন্তু মজার ব্যাপার উনিশশো চৌত্রিশ সালে শহরের প্রথম সঙ্গীত সম্মেলনের আলোচনাচক্রেও গানবাজনার তৎকালীন হাল হকিকৎ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। বিখ্যাত সঙ্গীতগুণী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী গানবাজনা দুরবস্থা দেখে হতাশ হয়ে ব্যবসায় নেমে পড়েছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর পরে উনিশশো উনসত্তর সালে সুরেশ সঙ্গীত সম্মেলনের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলা হয়েছিল, রসের উৎস ক্রমশ শুকিয়ে আসছে। সঙ্গীত সম্মেলন সংখ্যায় বাড়লেও গানের মান এগোচ্ছে না শ্রোতার মানও নিম্নগামী। পরিবেশ মোটেই অনুকূল নয়। দ্বৈত গানবাজনার বদলে এখন 'দৈত্য যুদ্ধ' হয়।

এরও কুড়ি বছর পরে, উননব্বই সালে পার্কসার্কাস সঙ্গীত সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়ার সময় উদ্যোক্তা সতীন সেন বলেছিলেন, এতদিন বৃথা চেষ্টা করেছি, শ্রোতা তৈরি করতে পারিনি, শিল্পীদের কাছে শিল্পের চেয়ে অর্থই বেশি কাঙ্খিত। এরপর থেকে ব্যবসাদারেরাই সঙ্গীত সম্মেলন করবে।' অর্থাৎ সকলেই নিজের সময়কে নিন্দা করে অতীতের প্রশংসা করে চলেছেন।

কিন্তু সেদিনের মতো হতে চাওয়া এই সময়ের পক্ষে গৌরবের নয়, তাকে এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে। সামাজিক-অর্থনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে অতীতের বহু জিনিসই হারিয়ে গেছে। ধ্রুপদ গাইয়ে আজ বিরল, পাখওয়াজকে হটিয়ে তবলা দখল নিয়েছে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের মঞ্চের, সারেঙ্গির বদলে এসেছে হারমোনিয়াম, বীণ-সুরবাহারকে পাশে সরিয়ে এসেছে সস্তুর গিটার ম্যান্ডোলিন, বিলম্বিত আলাপ এখন মধ্যলয় থেকে এগোয়, যন্ত্রসঙ্গীতে আলাপ

পরভিন সুলতানা

'শিল্পী-শ্রোতা-উদ্যোক্তা— সবারই মানসিকতা পাল্টে গেছে। বড় গান শোনবার শ্রোতা নেই, প্যাকেজ ডিলের যুগ। এখন ফাস্ট ফুড ফাস্ট মিউজিক। আসরে একজন শিল্পীর গানবাজনা শেষ হতে না হতেই অন্যজন উসখুস করে, প্লেন ধরবার তাড়া। একে অন্যের গানবাজনা শোনে না। মুষ্টিমেয় শ্রোতাদের কাছ থেকে সাধারণের কাছে চলে এসেছে গানবাজনা, এর ভাল দিকের সঙ্গেই খারাপ দিকটাও থাকবে। লঘু মানসিকতার শ্রোতাদের খুশি করবার দাম চাপছে শিল্পীদের উপর।'

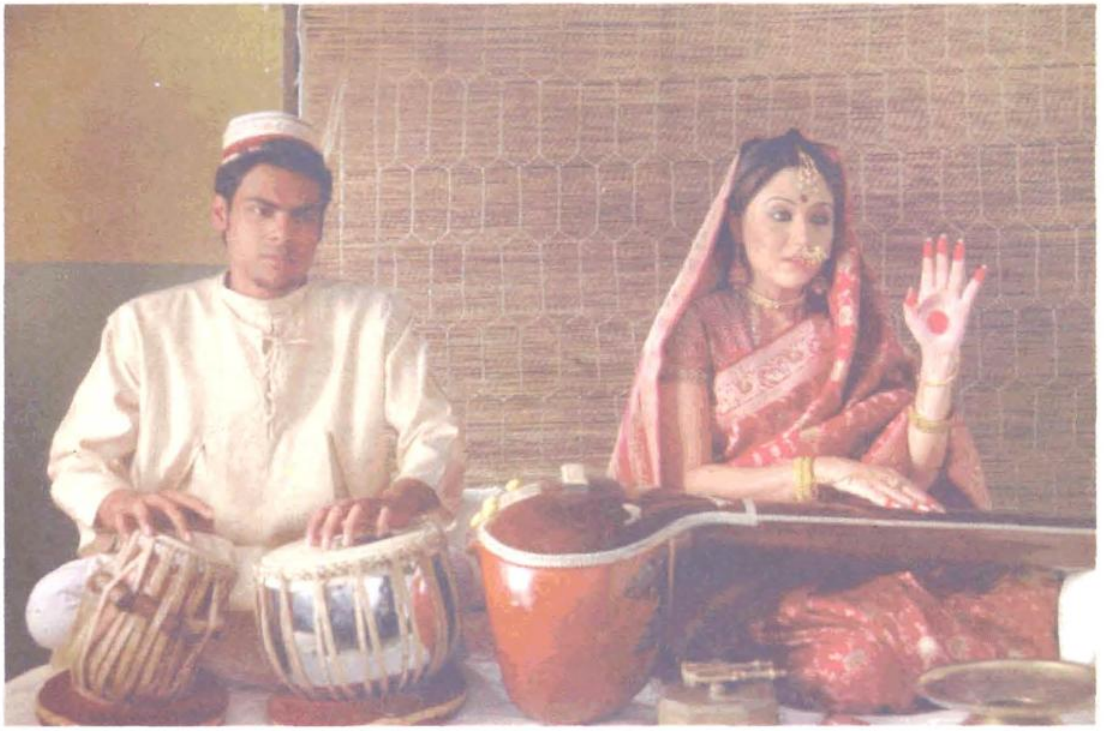

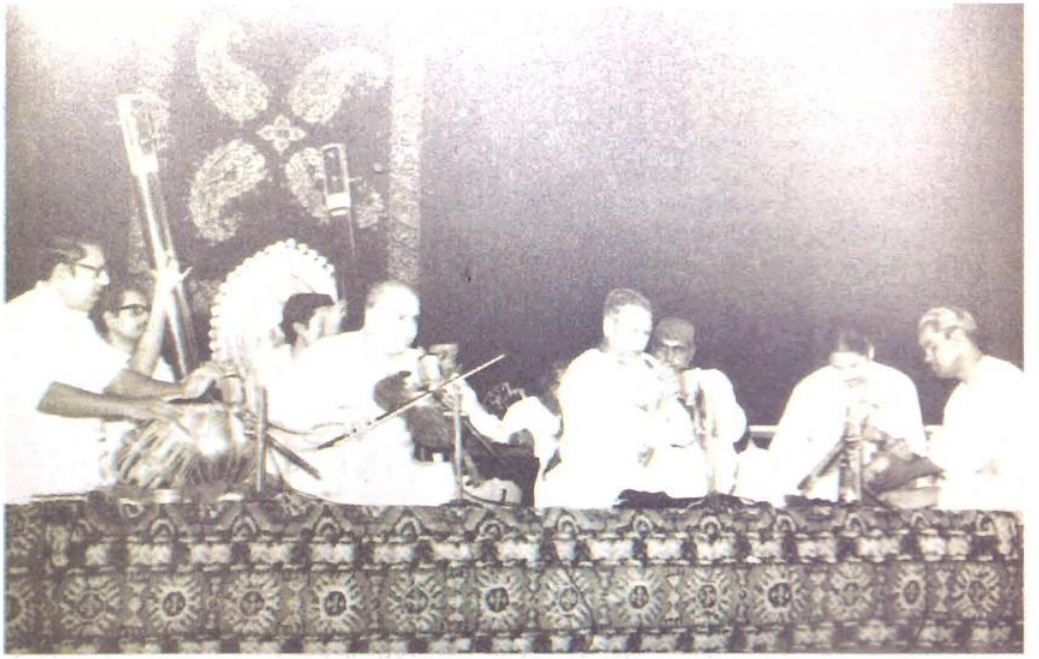

স্বপ্ন সম্মেলন : বিসমিল্লা খান, ভিজি যোগ, শান্তাপ্রসাদ

আমজাদ আলি খান

'জোয়ার-ভাটা জীবনে যেমন আছে, সঙ্গীতেও থাকবে। অতীতে যেমন গ্রেট মাস্টাররা ছিলেন, অ্যাভারেজ শিল্পীও ছিলেন। ট্রেন্ডসেটার শিল্পীরা সব যুগেই আসেন, সঙ্গীতের মানকে নতুন মাত্রা দেন, কাজেই তুলনা করে লাভ নেই। আমরা আজকের শিল্পীরা যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করবার দায়িত্ব নিই তা হলে আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গীত সম্মেলনের চেহারা বিবর্ণ লাগলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হবার কোনও কারণ নেই।'

এখন আওচার চরিত্রের। সর্বত্র এমন না হলেও প্রবণতা এমনই। একসময় কণ্ঠসঙ্গীত ছিল শাসকের ভূমিকায়, তার কাছ থেকে প্রভুত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল যন্ত্রসঙ্গীত। আপাতত অনেকক্ষেত্রেই তালবাদ্য হয়ে উঠছে নিয়ন্ত্রক এবং শ্রোতাদের উত্তেজিত করে হাততালি পাচ্ছে।

গতির যুগ এখন, তালবাদ্য বা তানকারি বা ঝালার গতিময়তার অতএব কদর বেশি। হাত-পা-অন্তর ছড়িয়ে, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে সঙ্গীত রস আস্বাদন এখন স্বপ্ন। চলতে চলতে, কাজ করতে করতে আড্ডা মারতে মারতে গান শোনা নতুন যুগের ফ্যাশন। রিমোট আঙুলের ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে বেডরুমের পৃথিবী, বিনোদনের জন্য মেধার শ্রম দিতে পারছে না নতুন প্রজন্ম, কারণ তা বিনিয়োগ হয়ে যাচ্ছে আই টি সেক্টরে। বাংলা ভাষাটাই ভুলতে চলেছে নতুন প্রজন্মের অধিকাংশ সদস্য ফলে বঙ্গসংস্কৃতি-হেরিটেজ শব্দগুলি এখন মেলায় বা প্রাচীন সৌধের সামনে উচ্চারিত হয় বেশি। হয়তো এই প্রজন্মকে যদি রাগসঙ্গীতে আকৃষ্ট না করা যায় শ্রোতা সংখ্যালঘু হতে বাধ্য। তবু এই বঙ্গদেশে রাগসঙ্গীত চর্চায় আগ্রহী শিল্পীর সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয় তবে সাধনার পরিবেশ—আত্মপ্রকাশের সুযোগ তাদের সামনে ক্রমশ কমে আসছে এটাই আশঙ্কার কথা।

জনসংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে মিডিয়ার প্রতাপ কিন্তু রাগসঙ্গীতের আসর বা অন্য মাধ্যমে সুযোগ সেই হারে বাড়েনি বরং কমেছে। দশবছর আগে যেমন ছিল, আজকের মিউজিক কনফারেন্সেও তেমনই মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পীর নামই বড় পয়েন্টে ছাপা হয়।

ভীমসেন যোশি শারীরিকভাবে সুস্থ নন। যশরাজও প্রবীণ হয়েছেন, কিশোরী আমোনকরকে সুলভ করা যায়নি, অতএব, পরভিন সুলতানা, হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, শিবকুমার শর্মা এখন আসরের বড় ভরসা এবং বিজ্ঞাপনের গ্ল্যামার। আলি আকবর-রবিশঙ্কর বিলায়েৎ দুর্লভ, বিসমিল্লা প্রয়াত, আমজাদ আলি খান এখন শিরোনাম, রাজন সাজন মিশ্র শহিদ পরভেজ, রনো মজুমদার, শুভা মুদগল আসরে উদ্যোক্তাদের ভরসা,

জাকির হুসেন

'আজকের কনফারেন্স আগের মতো নেই— এমন গেল গেল রব তোলার কোনও মানে হয় ন। আজকের এই পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। নতুন যা হচ্ছে বা লাগছে, তা অতীতের ভূমির উপর দাঁড়িয়েই হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুরই অ্যাপ্রোচ পাল্টে যায়। দরবারে পঞ্চাশজন শ্রোতার সামনে যেমন গানবাজনা হোত। আজ দশ হাজার শ্রোতার সামনে তেমন হলে চলবে না।'

অজয় চক্রবর্তী

'শিল্পী এবং শ্রোতার মধ্যে পরিবেশের প্রভাবে খানিকটা দূরত্ব তৈরি হয়ে থাকলেও, সেটা ঘুচিয়ে দেওয়া শিল্পীদেরই কাজ। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যেই এমন সম্মোহনী এবং পোটেনশিয়াল আছে, যা দিয়ে শ্রোতাকে মুগ্ধ করা যায়। আমরা যদি তা না পারি তা শিল্পীদেরই অক্ষমতা। প্রতিভার কোনও অনটন নেই, সঙ্গীতের সঙ্গে মেধার যোগও বাড়ছে। সার্বিক পথ অনুসরণ করলে ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আজেবাজে জিনিসে বাজারে ছেয়ে যাচ্ছে বলে ভাল জিনিসের কদর কমে যায়নি। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের যথার্থ পুষ্টি দিতে হবে, হতাশ্যর কোনও কারণ নেই।'

জাকির হুসেন এখনও ক্রেজ তবে তাকে আসরে বড় একটা পাওয়া যায় না। ডোভার লেনকেও বর্জন করেছেন জাকির। তেজেন্দ্রনারায়ণ বা আশিস খানের একক আসরে শোনা যায় জাকিরের বোলবাগী-টোনাল কোয়ালিটির যাদু। কলকাতার শিল্পীদের শিরোনাম গিরিজা দেবী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মণিলাল নাগ, অজয় চক্রবর্তী, রাশিদ খান, উলহাস কোশলকর, অরুণ ভাদুড়ি, মশকুর আলি খাঁ। ফাল্গুনী মৈত্র, মানস চক্রবর্তী, সমরেশ চৌধুরি, শুভ্রা গুহকে মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। তেজেন্দ্রনারায়ণ, তরুণ ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, দীপক চৌধুরি সৌমিত্র লাহিড়িকে সেভাবে পাওয়া যায় না। দেবাশিস ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি বোস, কুশল দাসের সঙ্গে প্রত্যুষ- পূর্বায়ণ চট্টোপাধ্যায় পার্থসারথি, সন্দীপ ভট্টাচার্যর মতো নতুন প্রজন্মের প্রতিশ্রুতি উঁকি দিচ্ছেন আসরে। কৌশিকী চক্রবর্তী-সন্দীপন সমাজপতি কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে নিজেদের চাহিদা তৈরি করেছেন।

তবলার ক্ষেত্রে বঙ্গদেশ আপাতত মোস্ট প্রোডিউসিং এরিয়া। শঙ্কর ঘোষ, গোবিন্দ বোস : মাঝেমধ্যে বাজান স্বপন চৌধুরি। শীতে উড়ে আসেন মার্কিন দেশ থেকে। কুমার বসু, সাবির খান, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, বিক্রম ঘোষ, সমর সাহা, আনন্দগোপাল, তন্ময় বসু, শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লার ঘোষ, শুভেন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের পথ ধরে বহু প্রতিভাবান তবলিয়ার কৃতিত্ব ধরা পড়ছে রাগসঙ্গীতের আসরে।

সঙ্গীত সম্মেলনে স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থানীয় শিল্পীদের বেশি করে সুযোগ দেওয়া দরকার—এ তথ্য ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। রাজ্যসঙ্গীত অ্যাকাডেমি পরিচালিত সঙ্গীত সম্মেলন এবং সল্টলেক সঙ্গীত সম্মেলন এ ব্যাপারে খানিকটা সক্রিয়। যেহেতু ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স এবং এস আর এ সম্মেলন এই মুহূর্তে শহরের অগ্রণী এবং নিয়মিত সঙ্গীতোৎসব, ফলে মিউজিক কনফারেন্সের গতিপথ নির্ধারণে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্পনসর নির্ভরতা যেমন আজকের বড়মাপের জলসায় মুশকিল আসান। তার পেছনেও রয়েছে সমস্যার ছায়া। জলসায় তারকা না থাকলে স্পনসর মেলে না। তারকাদের সম্মান দক্ষিণা ক্রমবর্ধমান অথচ তারকা না রাখতে পারলে জলসায় শ্রোতা হয় না। ছোটখাটো সঙ্গীত আসর এজন্যই ধুঁকছে। বড় সম্মেলনে শিল্পী নির্বাচনে স্পনসরদের হাত থাকছে, উদ্যোক্তারা অসহায়।

আলি আকবর বলেন, আগের দিনে জলসায় সামনের সারিতে বসে থাকতেন সঙ্গীতজ্ঞানে ধনী শিল্পী-সমঝদারেরা। তাদের দেখে গানবাজনা করার যোশ বেড়ে যেত, তাদের প্রশংসা পেলে উজ্জীবিত হতেন শিল্পীরা। আর আজ সামনের সারিতে বসে থাকেন টাকায় যারা ধনী, তাদের আচরণ দেখলে মেজাজ বিগড়ে যায়। এইসব দর্শকের অনেকের কাছেই ডোভার লেনের মতো সঙ্গীত সম্মেলনে যাওয়াটা স্ট্যাটাস সিম্বল। বিলায়েৎ খান এদের দেখেই বলতেন, রাগসঙ্গীতের গায়ে এখন ফ্যাশনের ছোঁয়া লেগেছে, 'ফিউশন' নামের কনফিউশন শুনে এরা ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের মজা পেতে চায়।

সময় যতই পাল্টে যাক, অ্যাপ্রোচ বদলে গেলেও কালের নিরিখে পরীক্ষিত হাজার বছরের রাগসঙ্গীত বাঁক নিলেও তার চলা থামবে না। এখন প্লাস্টিকের ফুলের যতই কদর হোক গোলাপের প্রতি আমাদের দুর্বলতা যায়নি, সিন্থেটিক ধূপ বা মোমবাতি এখন আর পুড়ে শেষ না হলেও ভালবেসে আমরা আজও পুড়ি, সুরের বিস্তার, রাগরাগিনীর প্রভাবে এখনও আমরা আবিষ্ট হই, সেতার সরোদের ঝংকার, বাঁশিতে ভালবাসার সুর এখনও আমাদের উজ্জ্বল করে। সরগমের আনন্দ, বিষাদ, রাগমালার হাতছানিতে আমাদের বিস্তার আছে, নিস্তার নেই।

রেওয়াজের সময় পি আর নয়

সেই সাধনার পরিবেশ নেই। স্থানীয় শিল্পীদের জন্য ন্যূনতম সম্মান—তাও নেই। এই পরিস্থিতিতে নতুনরা উঠে আসবে কী করে? প্রশ্ন কৌশিকী চক্রবর্তী দেশিকান-এর

এবারে শীতের মাইফেলে প্রোগ্রামের চাপ কেমন?

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, মাসে প্রায় গোটাদশেক কনফারেন্সে গাইতে হচ্ছে

এর বেশিরভাগটাই কি কলকাতায়?

ঠিক উল্টোটা, কলকাতার বাইরেই বেশি। এখানে তিন-চারটে কনর্সাটে গাইছি। বাকিটা বাইরে, মহারাষ্ট্র-দিল্লি—

কলকাতার মধ্যে ডোভার লেন —

ডোভার লেনে এবার নিয়ে পর পর ছ'বছর গাইলাম।

কলকাতায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের সম্মেলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে না কি?

আগের তুলনায় তো বটেই—

এতে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের সামনে নিশ্চয়ই সুযোগ কমে আসছে?

জনসংখ্যা বাড়লো, শিল্পীর সংখ্যা বাড়ছে, সেক্ষেত্রে সুযোগ কমে গেলে এ সমস্যা তো অনিবার্য। তবে এটাই একমাত্র সমস্যা নয়—

আপনার মতে অন্য প্রধান সমস্যাটা কী?

যে আসরগুলি হচ্ছে তার শিল্পী নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে গলদ রয়েছে। নির্দিষ্টভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকজন শিল্পীকেই পাওয়া যাচ্ছে আসরে, অথচ এই সময়ের অনেক যোগ্য শিল্পীই সুযোগ পাচ্ছেন না। এ ক্ষেত্রে বক্স অফিসের অজুহাত দেওয়া হয়, কিন্তু শিল্পীরা যদি সুযোগই না পান তা হলে তাদের অভিজ্ঞতা হবে কী করে, বক্স অফিসই বা তৈরি হবে কীভাবে?

স্পনসরদের চাপ শিল্পী নির্বাচনে প্রভাব ফেলে বলেই কি এমন হয়?

স্পনসর তো সব রাজ্যেই আছে, বড় বড় কনসার্ট স্পনসর ছাড়া কী করে হচ্ছে? কিন্তু মহারাষ্ট্রে যত বড় কনফারেন্সই হোক স্থানীয় শিল্পীরা আগে শোনাবে তার পর বাইরের শিল্পীরা আসবেন। এখানে কিন্তু 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায়না' প্রবাদটাই সত্যি হচ্ছে। এ সত্ত্বেও যাঁরা

যা শুনেছি বা জেনেছি তাতে অতীতের তুলনায় বর্তমানকে যথেষ্ট বিবর্ণ লাগে। ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট আছে, শ্রোতাদের ভাল গান-বাজনা শোনবার আগ্রহ রয়েছে অথচ সিস্টেম এবং পরিবেশের প্রতিকূলতায় দু'পক্ষের যোগাযোগ হচ্ছে না। ডিসহার্টেনিং

সুযোগ পাচ্ছে, তারাও যে যথার্থ মর্যাদা পাচ্ছে এমন নয়

অমর্যাদাটা কোন চরিত্রের?

ঘরের বা বাইরের, সব শিল্পীরই সমান গুরুত্ব হওয়া উচিত, কিন্তু আদতে তা ঘটেনা। যেমন ভীমসেন যোশি নিজে আমাকে ফোন করছিলেন পুনের সওয়াই গন্ধর্ব ফেস্টিভ্যালে গাইবার জন্য। এটাই আমার কাছে এত সম্মানের ব্যাপার যে পারিশ্রমিক না পেলেও আমি গাইতে রাজি হতাম... অথচ পুরো সম্মানদক্ষিণা এবং শিল্পীর প্রাপ্য সম্মান দুটোই স্বাভাবিকভাবে পেয়েছি। সেই সঙ্গে এটাও দেখেছি দশ হাজারের উপর দর্শক শ্রোতার সামনে আগে স্থানীয় শিল্পীদের গান-বাজনার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমরা বসে শুনেছি তাদের অনুষ্ঠান।

তার মানে যে কলকাতাকে একদা কনফারেন্সের তীর্থ বলা হত তার তুলনায় অন্যত্র গান গাইবার প্রাপ্তি বেশি?

কলকাতা আমার নিজের জায়গা, এখানকার আসরের প্রতি আমার দুর্বলতা বেশি নিশ্চয়ই, কিন্তু বাইরে গেয়ে আনন্দ বেশি পাচ্ছি এটাও মিথ্যে নয়। এখানে উদ্যোক্তাদের প্রথম কথাই হল রেটটা একটু কম করুন। বাইরে থেকে অ্যাভারেজ শিল্পীদের আনবার ক্ষেত্রে কিন্তু এই কার্পণ্য থাকে না, এর উপর বিজ্ঞাপন হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ফলে নতুনদের এক্সপোজার পাওয়া শক্ত? লড়াইটা ক্রমশ কঠিন হচ্ছে তাদের কাছে।

কৌশিকী চক্রবর্তীকেও কি এই লড়াইটা করতে হচ্ছে, এখনও?

তা হয়তো নয়। আমি দেশে-বিদেশে যত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাই, সব করে উঠতে পারি না। আমি নিজে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও শিল্পী হিসাবে আমি স্যাটিসফায়েড নই। আমার প্রজন্মের কত ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট সুযোগ পাচ্ছে না, এটা আমার কাছে দুঃখজনক— 'আই ফিল ফর দেম' আমি তো বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়, এই সময়েরই প্রতিনিধি। ফলে আমার কনটেমপোরারি শিল্পীরা সুযোগ বা মর্যাদা না পেয়ে হতাশায় ভুগলে ভবিষ্যৎ গান-বাজনার ক্ষেত্রে তা মঙ্গলের হতে পারে না।

ধ্রুপদী সংগীত চর্চার জন্য কাঙ্খিত সেই সাধনার পরিবেশ কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না?

সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, এর ভিতর থেকেই সংগীতানুরাগী চাইলে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারে— অন্য কাজের পাশাপাশি সময় বের করে নিতে পারে। তবে রেওয়াজ করার সময়টা যদি পাবলিক রিলেশন করতেই নষ্ট হয়ে যায় তা হলে অন্য কথা।

ডোভার লেন, এস আর এ ফেস্টিভ্যাল ছাড়া বড় আসর এখন কোথায়?

রামকৃষ্ণ মিশনে একটা বড় আসর হয়, তবে সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। মহিলা বর্জিত সে আসরে মহিলা বসেননি তা নয়, তবে তার জন্য কী যোগ্যতা জরুরি আমরা জানি না।

অতীতের জলসার সঙ্গে আজকের তুলনা করলে—

যা শুনেছি বা জেনেছি তাতে অতীতের তুলনায় বর্তমানকে যথেষ্ট বিবর্ণ লাগে। ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট আছে, শ্রোতাদের ভাল গান-বাজনা শোনবার আগ্রহ রয়েছে অথচ সিস্টেম এবং পরিবেশের প্রতিকূলতায় দু'পক্ষের যোগাযোগ হচ্ছে না। ডিসহার্টেনিং—

একদিকে শ্রুতিনন্দন বা এস আর এ এবং এর বাইরেও কত শিল্পীর নির্মাণ ঘটছে, অন্যদিকে কমে আসছে কনফারেন্স, এই ভারসাম্য কী করে রক্ষা হবে?

কী হবে জানি না— অবস্থাটা সংশ্লিষ্ট লোকজনেরা উপলব্ধি করলে পরিস্থিতি পাল্টাতে পারে। আশা করব এর চেয়ে বেটার কিছু হবে সামনের দিনে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, ভেরি হার্শ সিচুয়েশন।

সমঝদারি নেই হাততালি আছে

ঘটেছে শ্রোতাদের চরিত্র বদল, সঙ্গীত সম্মেলনের চালচিত্র। তারই মধ্যে সংকল্প স্থির রেখে নিজের অভীষ্টে পৌঁছতে চান **সন্দীপন সমাজপতি**

বেশি গুরুত্ব আমি দিতে চাই শিল্পীকে সম্মান জানানোর ব্যাপারটাতে। বাইরে আমার মতো একজন তরুণ শিল্পী অন্য সিনিয়র শিল্পীদের মতোই গুরুত্ব পেয়েছে। সন্দীপনজি ছাড়া কেউ সম্বোধন করেনি অথচ নিজের শহরে অনেক সময়ই এর বিপরীত অভিজ্ঞতা হয়।

এ মরসুমে আসরে গাইবার ব্যস্ততা কেমন?

এ সময় ব্যস্ততা একটু বেড়ে যায়। সদ্য বাইরে প্রোগ্রাম করে ফিরেছি। জানুয়ারিতে অন্তত গোটা দশেক কনফারেন্সে গাইতে হচ্ছে।

অনুষ্ঠানগুলো কি এ রাজ্যেই না অন্যত্র?

অন্য সময় বাইরের প্রোগ্রাম বেশি থাকে সম্প্রতি হায়দরাবাদ, এলাহাবাদ, দিল্লি, জয়পুর, আমেদাবাদ, বম্বে, পুনা, গোয়ায় অনুষ্ঠান করলাম। তবে জানুয়ারিতে কলকাতা এবং শহরতলীতে কয়েকটা অনুষ্ঠান আছে। অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স, বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ, দক্ষিণী সম্মেলন, খড়দহ, উত্তরপাড়া সঙ্গীত সম্মেলন। এবার রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনেও গাইলাম। এটা আমার কাছে খুবই সম্মানের।

কোথায় অনুষ্ঠান করে বেশি আনন্দ হয়?

গান গাইতে সব জায়গাতেই ভাল লাগে, তবে মহারাষ্ট্র বা পুনায় শ্রোতাদের রেসপন্স বেশি পাই। সওয়াই গন্ধর্বফেস্টিভ্যালে দু'বার গাইলাম। দিল্লির বিষ্ণু দিগম্বর জয়ন্তী সঙ্গীত সমারোহ, মুম্বইয়ের ন্যাশনাল সেন্টার অফ পারফর্মিং আর্টস, গোয়ায় দীননাথ মঙ্গেশকর ফেস্টিভ্যাল— এমন মেজর কনসার্টে গান করার অভিজ্ঞতা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। বাইরে ফিজ বেশি পাওয়া যায় এটা পেশাদার শিল্পীর কাছে নিশ্চয়ই সুখের, কিন্তু তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব আমি দিতে চাই শিল্পীকে সম্মান জানানোর ব্যাপারটাতে। বাইরে আমার মতো একজন তরুণ শিল্পী অন্য সিনিয়র শিল্পীদের মতোই গুরুত্ব পেয়েছে। সন্দীপনজি ছাড়া কেউ সম্বোধন করেনি অথচ নিজের শহরে অনেক সময়ই এর বিপরীত অভিজ্ঞতা হয়। বহু পরিশ্রম করে অনেক মূল্য দিয়ে একজন শিল্পী নিজেকে তৈরি করে, তাকে প্রাপ্য সম্মান দিতে কেন কৃপা বুঝিনা। কোনও কোনও উদ্যোক্তাদের আচরণ দেখলে মনে হয় গাইবার সুযোগ দিয়ে শিল্পীকে কৃতার্থ করেছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক।

আজকের সঙ্গীত সম্মেলনে গানবাজনার চরিত্র আগের চেয়ে কতটা পাল্টেছে?

গানবাজনার গুণগত মান বেড়েছে, মেধার প্রয়োগ বেড়েছে কিন্তু হৃদয়াবেগ কমে গেছে। টেকনিক্যাল স্কিল যতটা পাওয়া যায় গভীরতা ততটা নয়। এতে তাৎক্ষণিক মজা পাওয়া গেলেও তার রেশ কাটছে না। উপরন্তু যারা ভুল গাইছে তারাও কনফিডেন্টলি ভুল গাইছে—এটা অ্যালার্মিং।

নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু এদের আত্মপ্রকাশের মতো সঙ্গীতের আসর বাড়ছে কি?

বাড়ছে না তো বটেই। বরং আসরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে অন্যদিকে যোগ্য শিল্পী যে সুযোগ পাচ্ছে সেটাও বলা শক্ত। নামী শিল্পীরাও ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে। এই বুঝি তাঁদের বাজার গেল, ফলে তাঁরা কমপ্রোমাইজ করছেন, নতুন শিল্পীদের বাজার তৈরি হবার সুযোগই তেমন মিলছে না। ফলে ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলা যাচ্ছে না।

তবে প্রতিভাবান শিল্পী, যাদের উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা আছে তারা এতে হাল ছাড়বে না। তাদের জেদ আরও বেড়ে যাবে। নিজেদের যোগ্যতা দেখাবার সুযোগ পেলেই তারা প্রমাণ করে দেবে। যাদের সত্যিই ক্ষমতা আছে, তাদের আটকে রাখা যাবে না, তারা বেরিয়ে আসবেই। তবে গানবাজনাকে পেশা করবার আগে এখন লোকে বেশি ভাবছে, কারণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ানোর মতো হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

আজকের আসরে শ্রোতাদের চরিত্রও তো পাল্টেছে?

আমার নিজস্ব অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসরে আসছে, তাদের ভাললাগা বা চাহিদার কথা জানাচ্ছে—এটা আগের দিনে তেমন ছিল বলে মনে হয় না। তবে যথার্থ সমঝদারির চেয়ে হাততালি দেবার প্রবণতা বেড়েছে। সঙ্গীত সম্মেলনে শ্রোতার সংখ্যা কমছে। তবে টিভি চ্যানেলে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের অনুষ্ঠান হলে অনেকেই দেখছে। টিভিতে আমার কোনও অনুষ্ঠান দেখানোর পর টেলিফোন পাবার হার দেখে এটা টের পাই। অবশ্যই টিভিতে রাগসঙ্গীতের জন্য সময় খুবই কম। এখন যেমন মিডিয়া হাইপ—ভাইভার্সানের বিচিত্র হাতছানি। শ্রোতারা খানিকটা কনফিউজড। পত্রপত্রিকাতেও রাগ সঙ্গীতের শিল্পী বা গানবাজনা নিয়ে তেমন লেখাপত্তর দেখা যায় না। রিভিউ হয় বটে তবে তা অনেক ক্ষেত্রে এমন ডেস্ট্রাকটিভ বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যে তা থেকেও শ্রোতাদের ধন্ধ বেড়ে যায়।

সব মিলিয়ে সঙ্গীত সম্মেলনের চালচিত্রটি কি তরুণ প্রজন্মের কাছে হতাশাব্যঞ্জক?

হতাশাব্যঞ্জক বলব না, বলা যায় 'মোর চ্যালেঞ্জিং'। লড়ে জায়গা করে নিতে হবে, ফাঁকিবাজি দিয়ে এই কম্পিটিশনে টিকে থাকা যাবে না। যারা সহজে টাকাকড়ি বা নাম কিনতে চাইবে তাদের পক্ষে কিছু করে ফেলা শক্ত। যোগ্য শিল্পী আজ না হোক কাল সারভাইভ করবেই। আমার কাছে সুযোগ পাবার চেয়ে নিজেকে আরও যোগ্য করে তোলাটা চ্যালেঞ্জ। আমি গানবাজনার পরিবারের মধ্যেই জন্মেছি। বাবা সুকুমার সমাজপতি ফুটবলার হিসাবে বিখ্যাত হলে তার প্রথম প্রেম সঙ্গীত। পরিবেশ থেকেই আমি গানবাজনার প্রেমে পড়েছি। পেশা হিসাবে না নিলেও আমি গানবাজনা করতাম কিন্তু ক্রমশ সঙ্গীতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে আর কিছু করতে পারতাম না বলেই একে পেশা করেছি।

আমি এই সময়েরই একজন যে মানস চক্রবর্তীর মতো গুরুর একান্ত তালিম পেয়েছে, বাড়িতে প্রেরণা, সাধনার পরিবেশ পেয়েছে, আসরে গাইবার সুযোগ পেয়েছে, গুরুজনদের শুভেচ্ছা— রাম আশ্রম ঝার মতো গুণীর প্রশ্রয়, সমালোচক, শ্রোতাদের ভালবাসা, পরামর্শ পেয়েছে। তার মানে ইচ্ছা ও একাগ্রতা থাকলে, প্রতিকূলতা পেরিয়ে এগোনোর পথ বন্ধ নয়। আমাকে অনেক পথ পেরোতে হবে, এটুকুই বলতে পারি আই অ্যাম রেডি টু ফেস দ্য সিচ্যুয়েশন।

অল বেঙ্গলের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা থেকে উঁকি দিয়েছেন একের পর এক নক্ষত্র। দিকপাল সরোদিয়া রাধিকামোহন মৈত্র, বাঁশির যাদুকর পান্নালাল ঘোষ, অনন্য সেতারী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুগায়িকা মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেতারী অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য, ভক্তিগীতির অনতম শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য— এমন অনেকেই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের প্রতিযোগিতায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে পরিচিতি পেয়েছিলেন।

এই প্রতিযেগিতার ষষ্ঠ বছরে অর্থাৎ উনচল্লিশ সালে সঙ্গীত প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল পাঁচশো উনষাট। এর মধ্যে একাত্তর জন ছিলেন মহিলা শিল্পী। এর থেকে সেসময় সঙ্গীতশিক্ষার আগ্রহ এবং চর্চার একফালি চালচিত্র ধরা পড়ে। আসরে গান গাওয়ার ক্ষেত্রে যখন বাঈজিদেরই প্রাধান্য, সেই পটভূমিতে মধ্যবিত্ত সমাজে মহিলাদের মধ্যে সঙ্গীত অনুরাগ এবং চর্চার আগ্রহ কীভাবে বাড়ছিল সেটাও বোঝা যায় এই পরিসংখ্যান থেকে।

বাংলা মহিলা যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে অগ্রণী এনায়েৎ খানের শিষ্য রেনুকা সাহার প্রথম আত্মপ্রকাশ এই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের মঞ্চে।

উনিশো পঁয়ত্রিশ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে আয়োজিত হয়েছিল এক সঙ্গীতসভা। বাবার স্মৃতিতে হীরু গঙ্গোপাধ্যায় আয়োজন করতেন এই সভার। তিনি বিনা পয়সায় কার্ড বিলোতেন উদার হাতে, নিজে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের স্বাগত জানাতেন। সেদিন বিলায়েৎ খাঁ, পিতা কিংবদন্তি এনায়েৎ খান এবং খলিফা আবিদ হুসেনের এক বিরল যুগলবন্দি ঘটেছিল।

এই স্মৃতিবাসরেই এক অধিবেশনে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শেষ শিল্পী। সান্ধ্য অনুষ্ঠানের শিল্পীরা যখন গানবাজনা শেষ করেন তখন প্রায় মধ্যরাত। শ্রোতারা একে একে বেরিয়ে পড়ছেন, এমন সময় ভীষ্মদেব এসে পৌঁছলেন। অনেকেই চাইলেন ভীষ্মবাবুর গান হোক—অসময় হলেও শিল্পী রাজি হলেন। সব শ্রোতাই শেষ পর্যন্ত বসে পড়লেন।

ভীষ্মদেবের গান শুরু হল। মুগ্ধ শ্রোতারা ঘড়ির দিকে তাকাবার ফুরসৎ পেলেন না, বাড়ি ফেরার তাগিদ, খিদে, ঘুম শিকেয় তোলা রইল, যখন গান থামলো ততক্ষণে রাত ফুরিয়ে সূর্যোদয়ের পাটও চুকে গেছে।

রাগ সঙ্গীতের নক্ষত্র সম্মেলন। কখনও রবিশঙ্কর, কখনও বিলায়েৎ, কখনও বেগম আখতার, কখনও বা চমকে দিয়ে আসরে সুচিত্রা মিত্র! পুরনো কনফারেন্সের এমনই আশ্চর্য কিছু সুরবাহার

বেগম আখতার সুচিত্রা মিত্র

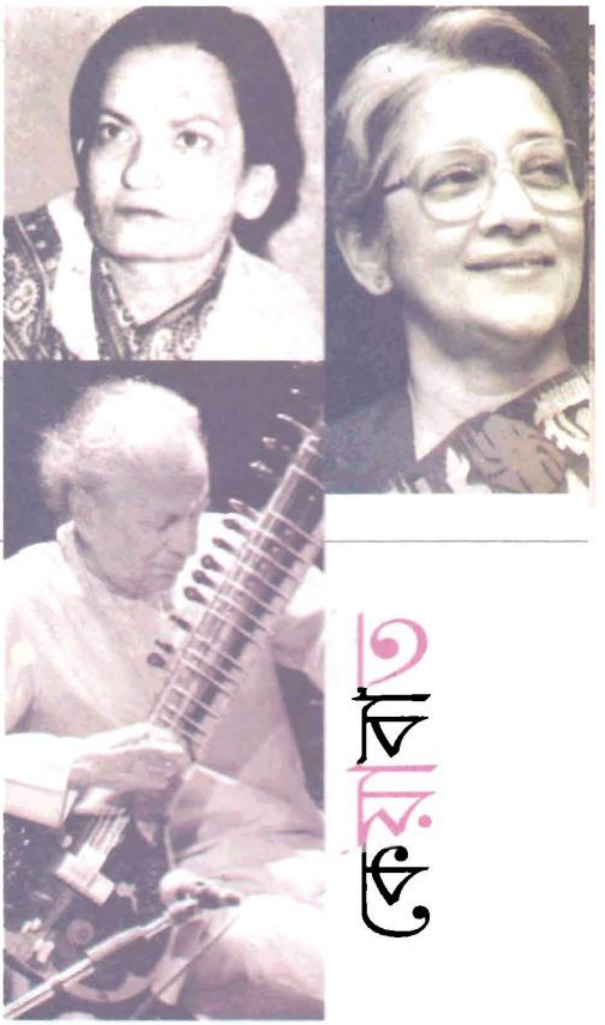

রবিশঙ্কর

অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স ধ্রুপদী সঙ্গীতের বাইরে অন্যান্য রীতিনীতিকেও পর্যাপ্ত প্রাধান্য দিয়েছে। 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র ভক্তিরসাবেশে উদ্দীপ্ত করে শুরু হতো আসর। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ঠুমরীর পাশাপাশি কণ্ঠসঙ্গীতের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে লোকসঙ্গীত—নানা ধরনের গান। একবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্য অপর্ণা দেবী পরিবেশন করেছিলেন কীর্তন, গিরিন চক্রবর্তী ঝুমুর গান গেয়েছেন এই সঙ্গীত সম্মেলনে, সুচিত্রা মিত্র পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। নৃত্যনাট্যও পরিবেশিত হয়েছে এই মঞ্চে। সব মিলিয়ে দেশের নানাপ্রান্তের শিল্পীদের বহু ধারার সঙ্গীতের সম্মেলন হয়ে উঠেছিল অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স।

ইন্দ্রদেব চট্টোপাধ্যায় বিলায়েৎ খান

ষাটের দশকের মাঝামাঝি ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনের একটি অধিবেশন জমে উঠেছে হীরাবাঈ বরোদেকরের গানে। সেদিন তিনিই ছিলেন প্রধান শিল্পী। এবং অনুষ্ঠান শেষ হবার কথা মধ্যরাতে। সীমান্তে সেই সময় একটি গোলমাল দানা বেঁধেছিল। তারই প্রভাবে হঠাৎই সেদিন শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার ফলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ডোভার লেনের উদ্যোক্তাদের জানালেন অত রাতে আসর শেষ করে এত শ্রোতাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে না ফেলে, সকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে। কিন্তু সে দিন অন্য শিল্পীর অনুষ্ঠান ছিল না। ফলে সারারাত অনুষ্ঠান চালানোর প্রস্তুতি ছিল না। উদ্যোক্তাদের মাথায় হাত। হঠাৎ একজনের চোখ পড়ল শ্রোতার আসনে বসে থাকা সরস্বতী রানের উপর। অগত্যা, তাঁকেই অনুরোধ জানানো হল, শিল্পীও কোনওরকম দ্বিধা না করে গাইতে রাজি হয়ে গেলেন। গানে গানে উৎকণ্ঠার বদলে শ্রোতাদের কাছে অপ্রত্যাশিত উপহার হয়ে এল সরস্বতী রানের সুরমূর্ছনার প্রশান্তি, কেটে গেল রাত।

আসরের শেষ শিল্পীই শ্রেষ্ঠ শিল্পী—এমন একটি অলিখিত ধারণা চালু আছে। উনিশশো চৌষট্টি, ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সে সারারাতের একটি অধিবেশনে ছিলেন দুই শ্রেষ্ঠ সেতারী রবিশঙ্কর এবং বিলায়েৎ খান। সে রাতে দু'জনের মধ্যে কে শেষে বসবেন তা নিয়ে সঙ্কট দেখা দিল। দু'জনের শৈল্পিক দ্বন্দ্বর কথা সকলেরই জানা। ফলে উদ্যোক্তারা বিপদে পড়ে দু'জনকেই নানাভাবে আগে বসবার জন্য অনুরোধ করে চললেন। শেষপর্যন্ত রবিশঙ্করই আগে বাজাতে রাজি হলেন। তিনি রাত দু'টো নাগাদ স্টেজে বসে ভোর ছ'টা পর্যন্ত বাজালেন। ফলে পরবর্তী শিল্পী বিলায়েতের জন্য আর তেমন সময় রইলো না। কিন্তু বিলায়েৎ বসলেন তাঁর রাজকীয় ভঙ্গীতে এবং ছ'টায় শুরু করে বাজনা শেষ করলেন সকাল দশটায়। অর্থাৎ রবিশঙ্করের সমান সময়— প্রায় চার ঘণ্টা। শ্রোতারা তখনও অধীর আগ্রহে শুনছেন। আরও বাজাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেও বিলায়েৎ উঠতে বাধ্য হলেন কারণ সেদিন ছিল সরস্বতী পুজো। অঞ্জলির ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে আশেপাশের বাড়িতে।

বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্পের সাহায্যার্থে উনিশশো একত্রিশ সালে কলকাতার অ্যালফ্রেড থিয়েটারে একটি চ্যারিটি শো-এর আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল একটি নাট্যদল অথচ আসর বসেছিল উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের। অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট দিনে হলভর্তি দর্শক অধীর অথচ নির্দিষ্ট সময় উত্তরে গেলেও অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে না। আসরের প্রথম শিল্পী এসে না পৌঁছনোর জন্যই এই বিড়ম্বনা। শ্রোতারা ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। গ্রিনরুমে বসেছিলেন পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদ আতা মোহম্মদ খাঁ, সঙ্গে তাঁর শিষ্যা সপ্তদশী তরুণী 'বিব্বি'। উদ্যোক্তাদের সমস্যা বুঝে আতা মোহম্মদ বললেন যদি চাও তো এই বেটিকে বসিয়ে দিতে পারো। ও শুরু করুক, এর মধ্যে যদি নির্দিষ্ট শিল্পী না আসেন, আমিই তৈরি হয়ে নিচ্ছি বসবার জন্য। তখন আর ভাবাভাবির সময় ছিল না। উদ্যোক্তারা মেয়েটিকে স্টেজে নিয়ে উদ্বোধনী গানের শিল্পী হিসেবে নাম ঘোষণা করে দিলেন। মেয়েটি আগে এত বড় কোনও অনুষ্ঠানে গান করেনি। ফলে বেশ হকচকিয়ে গেছে, তবু গুরুর আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয় বলে সে শুরু করে দিল একটি গজল, মেয়েটির গায়নভঙ্গি, কণ্ঠের মাদকতায় মুগ্ধ শ্রোতারা একের পর এক ফরমায়েশ করে যেতে লাগলেন। মেয়েটি ততক্ষণে আত্মবিশ্বাস পেয়ে গিয়েছে। পর পর চারটি গজল পাঁচটি দাদরা গেয়ে আসর জমিয়ে উঠে গেল বিব্বি। পরের শিল্পীর কাজ কঠিন হয়ে গেল। সেদিনের সেই মেয়েটি বেগম আখতার, ডাকনাম 'বিব্বি'। এভাবেই ভবিষ্যতের গজল সাম্রাজ্ঞীর অভিষেক হয়ে গেল কলকাতার আসরে।

পথের পাঁচালি

গণপুর অঞ্চলের জলে, বনে, জঙ্গলে হাবিল প্যাডেলঅলাই ত্রাতা। পশুপাখির প্রতিপালন, থেকে চন্দনবীজের হার—যেন শাপগ্রস্ত নল। কিরাত, গুইকের ইতিহাসের এক অমোঘ প্রতিভূ

জয়া মিত্র

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসছি। হাবিলের মোটর বাইকের পেছনে বসে। দীর্ঘ শাল গাছের বন। আশপাশে প্রচুর নিম, কিছু পলাশ কিছু মহুয়া, এটা সেটা আরো, কটা গাছই বা চিনি! শালের সটান গুঁড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে হেলে পড়া রোদ লাগছে চারদিকে। পাখি ডাকছে কি না শোনা যাচ্ছে না, হাবিল মহা উৎসাহে কথা বলে যাচ্ছে। বীরভূমে রামপুরহাট ব্লক ওয়ানের এই ছোট আদিবাসী গ্রামটায় একমাস দু-মাস পর যখনই আসি, ফেরবার সময়ে তেরো-চোদ্দ কিলোমিটার দূরে রেল স্টেশনে পৌঁছে দেয় হাবিলই। এটা গণপুরের জঙ্গল। ১৮৫৫ সালে সিধু কানহু দুই সাঁওতাল ভাই এই অঞ্চল থেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে রওনা হয়েছিলেন কলকাতায় বড়লাটের কাছে নালিশ জানাতে। পথে এই গণপুর জঙ্গলেই পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তাঁদের। সে ভিন্ন গল্প।

সে ভিন্ন জঙ্গলও।

এখন জঙ্গল খুব গরিব। খানিকটা শিঁটিয়ে থাকা যেন। জঙ্গল হাসিল করে কিছু কিছু জায়গায় ক্ষেত হয়েছে পথের কাছ ঘেঁষে। কিছু জায়গায় সব শাল কেঁদ গামার কেটে নেবার ফলে ফাঁকা পড়েছিল, ইদানীং বনদপ্তর মহাউৎসাহে সেখানে হেক্টর কে হেক্টর ইউক্যালিপটাস বসিয়েছেন। আগের জঙ্গল কাটবার পারমিটও বনদপ্তরেরই দেওয়া ছিল। যা চোখে দেখা যাচ্ছে, তার পেছনের জ্ঞান এই যাওয়া আসার পথে হাবিলের কাছ থেকে পাই অনেকটা।

হাবিল শেখ আদিবাসী নয়। এমনকী, গ্রামবাসীও নয়। হাবিল রিকশা চালাত রামপুরহাটের কাছাকাছি ছোট শহরে। বছর দশেক আগে দুটি তরুণ ছেলে কলকাতার মফস্বল থেকে রামপুরহাটে এসে নামত সন্ধ্যের ট্রেন

ধরে। ছোট স্টেশনে অনেকবারই হাবিলের রিকশার সওয়ারি হত তারা। ছোট সস্তার হোটেলে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে যেত গ্রামের পথে। তিন-চার-পাঁচদিন পর আবার ফিরে দোকানে সাইকেল জমা রেখে বিকেলের ট্রেন ধরে চলে যেত দিন দশেক পর আবার আসবার জন্য। রিকশায় ওঠার পরও এক মিনিট থামত না কিংবা অন্য কোন বিষয়ে কথা বলত না ওরা। কেবল সেই গ্রাম, গ্রামের লোকজনের সুখ-দুঃখ, পাথর, খাদানঃএই সব নিয়েই কথা বলে যেত অনর্গল। হাবিলের সঙ্গে দু-একটা কথা যখন বলত, তখনও সেই একই বিষয়। হাবিলের বেশ লাগতে লাগল। কে এরা? লেখাপড়া শিখেছে। চাকরিবাকরি না করে এইভাবে কেন নিজেদের সময় 'এনার্জি' সব খরচ করে এখানে এসে পড়ে থাকে! সে চিরকাল জানে একটু পয়সা হাতে এলেই শহরে চলে যেতে হয় শহরে আরাম আছে, পয়সা উপার্জনও সহজ। আর এরা এরকম উল্টো! ধীরে ধীরে হাবিল দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যের পর দীনুর হোটেলে এসে বসে থাকত। শুনতো দাদাদের কথা। বয়সে তার থেকে ছোটই তবু তো লেখাপড়া জানা। তবু তো কলকাতার ছেলে! দাদা তো বলতে হবেই।

অবশ্য হাবিলও কম কিছু নয়। নিজেকে সে বলে প্যাডেলওয়ালা। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল, বাচ্চাকাচ্চাও পাঁচটা। আরও তিনজনকে সে পালে। একটা তার বোনের মেয়ে—বোবা, দাঁড়াতে পারে না। আর দুটো এতিম। তার পাড়ারই এক বেওয়ার দুই ছেলে। তা ছাড়া বাড়িতে গরু আছে, মুরগি আছে। বৌ ছাগল পালে। বছরে তিনবার দুটো তিনটে করে ছানা বেচে। তার পয়সা সংসারে দেয় না। তা না দিক। মেয়েদের হাতে দুটো পয়সা থাকলে ভালো। নেশাটেশা তো আর করে না, ও টাকা বাড়বে। জমি আছে কয়েক কাঠা, একটা ছোট পুকুর। সেটাকে ডোবাও বলা যায়। সবই ভালো কেবল নেশাটা ধরে গেছে বড্ড। সন্ধ্যার পর একটু খাওয়াই চাই। তেমন যে কিছু হাঙ্গামাহুজ্জত করে এমনও নয়। তাদের এখানে শান্ত জায়গা। লোকজনও শান্ত। তবে কি, অনেকদিন ঠিক একই রকম কাটলে হাবিলের ভাল লাগে না। একটু পানসা মতো মনে হয়। তাই এক আধদিন—

প্যাডেল ছাড়াও নানারকম কাজ করেছে হাবিল। এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুর কম্পাউন্ডারি করত। হোমিওপ্যাথির প্রায় দুশো ওষুধ আর তাদের ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রির যে কোন ওষুধের শিশি এনে ডাক্তারবাবুর সামনে হাজির করা ছিল তার কাজ। সে যে পড়তে পারে না সে-কথা ডাক্তারবাবুও জানতেন না অনেকদিন। শিশির গায়ে লেখাগুলোর ছবি মনে থাকত তার। হ্যাঁ, সবগুলোরই। ভুল হত না।

সেই দাদাদুটোর সঙ্গে দু-চারবার সেই দূরের গ্রামটায় গিয়েছিল হাবিল। শেষে তার এমন মন লেগে যায় যে প্যাডেল চালানো কম আর গ্রামে থাকা বেশি হতে লাগল। জঙ্গলের ধারে ধারে জন্মায় বেনা ঘাস, সাঁওতালরা তাকে বলে 'সিরম'। তার বুনট করে গয়না তৈরি শিখল। শিখল আর কেমন করে, একটা হার নিয়ে তার বুনটটা খুলে ফেলল। এ-রকম করে তো সে শার্ট-পাজামাও সেলাই করতে শিখেছে। পুরোটা খুলে আবার সেলাই করে। এখন হাবিল কুঁচ, রাজমা কি সীমবীজ, গরগণ্ডা বলে ঘাসবীজ কি লাল টুকটুকে চন্দনবীজ দিয়ে এমন সব কানের গলার গয়না বানায়। কলকাতা-দিল্লির হস্তশিল্প মেলায় হৈ-চৈ করে বিক্রি হয়ে যায় সে সব।

হাবিল বাড়িতে যেত সপ্তাহে দশদিনে একবার। সব দেখাশোনা করে আসত। ডোবায় মাছ। জমিতে লঙ্কা বেগুন সিম লাউকুমড়ো শাক। পাড়াঘরের লোকজনদের বোঝায় বাড়িতে একটু জমি হলেই দুটো সবজি চারা বসিয়ে দাও। থাকে কিন্তু গ্রামেই। কতো কাজ। দাদার বুদ্ধি আছে ঠিকই, কিন্তু সব কিছু বুঝতে পারে না তো! আর এই ঘাসিরাম সোনামণি তার বাচ্চা, রামপদ এদের সকলকে বড্ডো ভালোও লেগে যায় হাবিলের। তাকে না হলে এদেরও একদণ্ড চলে না।

সে না থাকলে প্যাডেলওয়ালা গান শোনায় কে! হাবিল গল্প করে কেমন করে একবার চাঁদনি রাতে এঁচোড় চুরি করে আনতে গিয়ে ফাঁকা মাঠে এক ভাইপো-বৌ-এর পেত্নীর খপ্পরে পড়েছিল। নিজের নয়, পাড়াতুতো ভাইপো-বৌ। হাবিল যতো তাকে কথা বলে বলে ভুলিয়ে আনতে চায় পীরের মাজারের দিকে, সে ততো বল দিয়ে হাবিলকে টানে হিন্দুদের শ্মশানের দিকে। পষ্ট দেখেছিল তার গোড়ালি উল্টোদিকে।

এখন মাঝে মাঝে এক একবার ইচ্ছে হয়, লেখাপড়াটা শিখলে হত! না হলে কাজে একটু অসুবিধা হয়ে যায়। দাদা একবার টেলিফোনে হোর্ডিং আঁকিয়ে রাখতে বলেছিল। সে একটা বড় হরিণ আঁকতে দিয়েছিল শংকর বোর্ডওয়ালাকে। সেই রং শুকোতে দেরি। খুব ঝামেলা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় হাবিলকে দেখলে বেশ হত। হাবিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখলেও দিব্য হত। চমৎকার মালিশ করে। যে যখন পারে হাবিলের হাতের নাগালে গিয়ে বসে। সবকিছুর পরও কোথায় যেন একটা অচেনা ধুলো গুল্ম আছে হাবিলের ভেতরে। ছোট ছোট হলুদ ফুল, রহস্যময় অন্ধকার ঝোপ, মিহি কাঁটার জাল।

কলিকাতায় নবকুমার

সমরেশ মজুমদার

তেল আনতে গিয়ে ফের পনেরোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নবকুমারের। পনেরো তাকে মাসির সঙ্গে বেশি কথা বলতে বারণ করে। ছুটকিদের পরিবারের সঙ্গে গল্প করে নবকুমার। তখন ডানকুনি ছাড়িয়ে ট্রেন কোলকাতা ঢুকছে।

৬

অন্ধকার নেমেছিল আগেই। ঝুপঝুপ করে মাঠঘাট, চাষের ক্ষেত ঢেকে ফেলেছিল। তারপর হঠাৎ যেন বড় বড় কয়েকটা জোনাকিকে জ্বলতে দেখল নবকুমার। কিন্তু এত বড় জোনাকি কী করে হবে? ট্রেনের জানলা দিয়ে সে আচমকা অজস্র আলো জ্বলতে দেখল। সেই আলোয় আলোকিত দোতলা, তিনতলা বাড়িঘর। ঠাসাঠাসি। চলন্ত ট্রেন থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। সেই রাস্তায় লোকজন, গাড়ি। আর এতক্ষণ যে ট্রেনটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছিল সে হঠাৎ পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো বিপুল বিক্রমে ছুটতে শুরু করেছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে নবকুমার মাস্টারদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কলিকাতায় এসে গিয়েছি, না?'

মাস্টারদা মাথা নাড়ল, 'উল্টোডিঙি পেরোচ্ছে। যদি এখানে থামে তা হলে আমরা টুক করে নেমে পড়ব। এখান থেকে চিৎপুর কাছে।'

ঝাঁ চকচকে আলোজ্বলা প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকল। প্রথমে মনে হল এখানে ট্রেন দাঁড়াবে না। কিন্তু গতি কমতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আলো না থাকা প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়ে হাটি হাটি পা পা করতে লাগল। মাস্টারদা দ্রুত তার ঝোলা নিয়ে দরজা থেকে পা বাড়াল প্ল্যাটফর্মে। নেমেই চেঁচিয়ে বলল, 'ইঞ্জিনের দিকে মুখ করে নামো, নইলে পড়ে যাবে।'

স্যুটকেশ সামলে হোঁচট খেতে খেতে সামলে উঠে নবকুমার দেখল ট্রেনটা আবার গতি বাড়াচ্ছে। কামরাগুলোর জানলায় মানুষের মুখ। এক সেকেন্ডের কম সময়ের জন্যে মন্দিরার মুখ দেখতে পেল সে। তারপর চারপাশ অন্ধকার।

নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'মাস্টারদা, ট্রেনটা তো কলিকাতায় যাবে। আমরা এখানে কেন নেমে পড়লাম? আমাদের তো কলিকাতায় যাওয়ার কথা।'

'আচ্ছা পাগল। এটাও কলিকাতা। তোদের গ্রামে যেমন উত্তরপাড়া, বামুনপাড়া, দক্ষিণ পাড়া, বাগদিপাড়া থাকে তেমনি কলিকাতাতেও অনেক পাড়া আছে। এই যেমন উল্টোডিঙি, এখান থেকে আমরা যাব আর এক পাড়াতে, যার নাম চিৎপুর। এসব কলিকাতার পাড়া।' মাস্টারদা হাঁটতে হাঁটতে বোঝাচ্ছিল।

বেরোবার রাস্তা অদ্ভুত। দু'দুটো ট্রেন লাইন পেরিয়ে সরু পাথরে পা ফেলে উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে চলে এল মাস্টারদা। সেখান থেকে নিচে নেমে আসতেই পৃথিবীর সব শব্দ যেন একসঙ্গে কানের সুড়ঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে লাগল। অটোর হর্ন, গাড়ির আওয়াজ এবং মানুষের চিৎকারের সঙ্গে মাথার ওপর ব্রিজ দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রেনের চাকার আওয়াজ মিলেমিশে ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি করেছে। নবকুমার এক হাতে স্যুটকেশ অন্য হাতে কান চাপা দিল। ততক্ষণে হাত নেড়ে একটা অটো রিকশা থামিয়েছে মাস্টারদা, 'চিৎপুর?'

'বিকে পাল।'

'বেশ তাই চল, উঠে এসো নবকুমার।'

নবকুমার উঠতেই অটো ছাড়ল। পিছনে আর একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। একটু পরে ড্রাইভারের দু'পাশে আরও দুজন করে কোনওমতে শরীর একচিলতে জায়গায় ঠেকিয়ে বসল। দুপাশে আলো ঝলমলে দোকান, বড় বড় বাস, অগুণতি মানুষ। নবকুমার বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল। এই শহরের নাম কলিকাতা।

সামনে একটা ব্রিজ আসছে। পাশে বসা লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে ভাই? কটক না ভুবনেশ্বর?'

মাস্টারদা খিঁচিয়ে উঠল, 'হঠাৎ ওই নামগুলো মনে পড়ল কেন আপনার?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'নামটা শুনে তাই ভাবলাম। আজকাল ওড়িশাতেই নবকুমার নামটা শুনতে পাওয়া যায়। আমাদের পাড়ার পানের দোকানদারের বাড়ি কটকে। ওর নাম নবকুমার। আমরা নব বলে ডাকি।'

মাস্টারদা নবকুমারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'যত্ত সব।'

অটোয় যেতে যেতে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল নবকুমারের। রাস্তায় আরও মানুষ, অটো, হাতটানা রিকশা, গাড়ি বাসের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কখনও মনে হচ্ছে তাদের অটোকে পাশের বাসটা যে কোনও মুহূর্তেই ধাক্কা দেবে। আবার সামনের রাস্তা দেখাই যাচ্ছে না মাঝে মাঝে। কলিকাতার মানুষগুলোর এতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। গাড়ির জটলার মধ্যেই তারা সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে রাস্তা পারাপার করছে।

শেষ পর্যন্ত যেখানে অটো রিকশা থেকে নামতে হল সেখানে পায়ের নিচে ট্রাম লাইন। ট্রামের কথা নবকুমার জানে। এই পথটুকুতে সে একটিও ট্রাম দেখেনি।

'দশটা টাকা দিয়ে দাও।' মাস্টারদা বলল।

সযত্নে রাখা টাকা থেকে দশটা টাকা বের করে নবকুমার মাস্টারদার হাতে দিতে সে ভাড়া মিটিয়ে দিল। মাস্টারদা বলল, 'তোমাকে পয়সা খরচ করাচ্ছি। দলে না গেলে তো অগ্রিম পাব না। পেলে শোধ করে দেব।'

ততক্ষণে দোকানপাট বন্ধ হতে চলেছে। আলো নিভছে। মাস্টারদার সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে কেবলই হোঁচট খাচ্ছিল নবকুমার। পথ ভাঙাচোরা। কোথাও কোথাও কাদা পড়ে আছে। সে বলল, 'মাস্টারদা, কলিকাতার পথ বড় খারাপ কেন?'

'পাঁচ ভূতের ব্যাপার। তার ওপর খোট্টা পাড়া। আজ সারালে কালই এই অবস্থা হবে। চোখ মেলে হাঁটো।' মাস্টারদা উপদেশ দিল।

শেষ পর্যন্ত এক চৌমাথায় এসে মাস্টারদা বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল হে।'

'মানে?'

'এই হল চিৎপুর। তাকিয়ে দ্যাখো ঘরে ঘরে যাত্রার বিজ্ঞাপন ঝুলছে। কিন্তু নটা বেজে যাওয়ায় সব দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে।' মাস্টারদার গলা বিষণ্ণ।

নবকুমার দেখল। রঙিন রঙিন পোস্টার। বধূ এল ঘরে। ডাইনির নাম শাশুড়ি। দজ্জাল বউ-এর ভেরুয়া স্বামী। কমলে কামিনী। ফাটাফাটি হান্টারওয়ালী। এরকম কত নাম। নবকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'এসব যাত্রার নাম?'

'হ্যাঁ।'

'ঐতিহাসিক যাত্রা এখানে হয় না।'

'আর কী বলব ভাই। আমার তো বঙ্গে বর্গী, শাজাহান, সিরাজ—সব পার্ট মুখস্থ। কিন্তু পাবলিক ওসব আর দেখতে চায় না।'

'ঠিক। আমাদের গ্রামে গেল শীতে যাত্রা এসেছিল কলিকাতা থেকে, 'শাশুড়ি বনাম বউমা।' নবকুমার হাসল, 'মেয়েরা ঝেঁটিয়ে গিয়েছিল।'

'তা তো হল। এখন কী উপায়?' মাস্টারদাকে চিন্তিত দেখাল। একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা, চল।' হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'মন দিয়ে শোন। নিজেকে এখন থেকে হাঁস বলে ভাবতে শুরু কর। জলে নামবে কিন্তু শরীর ভেজাবে না।'

'সেটা কী করে করব?'

'দেখবে শুনবে কিন্তু জড়াবে না, কোনও কিছু ভাল বা খারাপ লাগলেও আগ বাড়িয়ে প্রকাশ করবে না। তিন বাঁদরের ছবি দেখেছ?' মাস্টারদা হাঁটতে হাঁটতে তাকাল।

'কোন তিন বাঁদর?'

'একজন চোখ ঢেকেছে, দ্বিতীয়জন কান, তৃতীয়জন মুখ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কলেজে দেখেছি।' নবকুমার মজা পেল।

'ঠিক ওইরকম হয়ে থাকবে। তুমি কিছু বলছ না, শুনছ না, দেখছ না।'

'ঠিক আছে।' নবকুমার মাথা নাড়ল।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা আধো আলোর গলিতে ঢুকল মাস্টারদা। গলির মুখেই যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখে রঙ মাখা বলে মনে হল নবকুমারের। ওদের দেখে খিকখিক করে হেসে একজন হিন্দি গান গাইতে লাগল। আর একজন 'আ যা আ যা' বসে দু'হাত দু-দিকে মেলে নিতম্ব দোলাতে থাকল। চাপা গলায় মাস্টারদা একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। সিঁড়ির মুখেও মেয়েদের জটলা। হারমোনিয়ামে গলা মিলিছে কোনও মেয়ে কাছাকাছি ঘরে।

একটা ঘরের ভেজানো দরজায় টোকা মারল মাস্টারদা, 'শেফালি মা, শেফালি মা!'

'কে? কে ডাকে! চেনা গলা বলে মনে হচ্ছে। মুক্তো, দ্যাখ দিকিনি।' ভিতর থেকে গলা ভেসে এল। তারপর যে দরজা খুলল তাকে দেখে চোখ কপালে উঠল নবকুমারের। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, তেমনি চওড়া, আবলুশ কাঠের মতো কালো, চুড়ো করে চুল বাঁধা বলে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। মাস্টারদার দিকে তাকিয়ে গজদন্ত বের করল, 'ও, ম্যাস্টর এসেছে মা। ও পাড়ার ম্যাস্টর। সঙ্গে যে তাকে চিনি না।'

রাত বাড়ছিল। ওপাশের ঘরগুলোতে গান বাজনা থেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে জড়ানো গলায় কোন মাতাল চিৎকার করে উঠছে। নবকুমারের মনে হল শেফালি মা যতই ভাল হোন এই পরিবেশে থাকা ঠিক নয়

ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে ঝুঁকে নমস্কার করেছে মাস্টারদা। 'জানি বিরক্ত করছি।'

যিনি আধশুয়ে ছিলেন খাটে তার পরনে গরদ, সেই রঙের ব্লাউজ। ফর্সা, বেশ মোটাসোটা, মুখে বোধহয় জোড়া পান। মুক্তোকে ইশারা করল তিনি। মুক্তো দ্রুত পিক ফেলার পাত্র তুলে নিয়ে পাশে ধরল। ধীরে সুস্থে তাতে পানের পিক ফেলে উঠে বসল শেফালি মা। আস্তে আস্তে তাঁর মুখে হাসি ফুটল, 'জানো যখন, তখন বিরক্ত করছ কেন? এতো জ্ঞানপাপী!'

মাস্টারদা মুখ নামালো, 'না করে পারলাম না। সোজা দেশ থেকে আসছি। সঙ্গে এ এসেছে। এর নাম নবকুমার। প্রথম গ্রামের বাইরে এল। পথে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল অনেক ঘণ্টা। ফলে যখন পৌঁছলাম তখন যাত্রার গদি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

শেফালি মা এবার নবকুমারের দিকে তাকালেন, 'পুরো নাম কী?'

'নবকুমার রায়।'

'বামুন নয় তো?'

'না।'

'কখনও গ্রামের বাইরে যাওনি?'

চট করে মাস্টারদাকে দেখে নিল নবকুমার। শেষ পর্যন্ত সত্যি কথা বলল, 'গিয়েছি। গঞ্জে। সেখানকার কলেজে পড়েছি।'

'শহরে যাওনি?'

'আজ্ঞে না।'

'কদ্দুর পড়েছ?'

'বিএ পাশ করেছি।'

'বাব্বা। এ তো লেখাপড়া জানা ছেলে! কী উদ্দেশে এখানে এলে?'

'রোজগার করতে। চাকরির চেষ্টা করব।'

'থাকবে কোথায়?'

'মাস্টারদা বলেছে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

শেফালি মা এবার মাস্টারদার দিকে তাকালেন। 'একেবারে হরিণশিশুকে শহরে নিয়ে এলে মাস্টার। এ তো কসাইদের খপ্পরে পড়ল বলে। থাকো এখানে আজ রাত্রে। কাল ওকে নিয়ে যাত্রার গদিতে চলে যেও। মুক্তো, ও পাশের ঘরে নিয়ে যা ওদের।'

মাস্টারদা বললেন, 'নব, শেফালি মাকে নমস্কার কর।'

নবকুমার ঝুঁকে নমস্কার করতে শেফালি মা বলল, 'শোন ছেলে। মাস্টার তোমাকে কোন পাড়ায় নিয়ে এসেছে তা বুঝেছ তো?'

মাথা নেড়ে না বলল নবকুমার।

'বোঝনি? এ্যাঁ! বলে কী? এতগুলো মেয়েমানুষ ডিঙিয়ে এই ঘরে ঢুকলে আর বুঝতে পারলে না বাবা। এটা হল বেবুশ্যেদের পাড়া। ভদ্দরলোকেরা টাকা দিয়ে মজা লুঠতে আসে এখানে। তুমি আমাদের দুজনের বাইরে আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না। নিজের মা কি আজও বেঁচে আছেন?' শেফালি মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

'যখনই এদের দেখবে তাঁকে স্মরণ করবে। কোন ফাঁদে পা দেবে না। যাও।'

মুক্তো তাদের যে ঘরে নিয়ে এল সেখানে একটা বড় খাট পাতা আছে। মুক্তো বলল, 'পাশেই কল পায়খানা। সব সেরে নাও। একটু পরে খাবার দিয়ে যাচ্ছি। কপাল ভাল।'

'কী রকম?' মাস্টারদা হাসল।

'এই ছোঁড়া সঙ্গে আছে বলে মা থাকার জায়গা দিল।'

খাওয়া শেষ করে ওরা পাশাপাশি শুয়ে পড়ল আলো নিভিয়ে।

অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্ন মনে ফুটছিল সেটা উগরে দিল নবকুমার, 'মাস্টারদা, শেফালি মা এখানে থাকেন কেন?'

'বাঃ। থাকবে না? এই বস্তির বাড়িওয়ালি তো উনিই।'

'বেবুশ্যেদের বাড়িওয়ালি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওকে দেখে তো মনেই হয় না।'

'কেন?'

'উনি কত্ত ভাল।'

অন্ধকারে মাস্টারদার হাসি শোনা গেল, 'এককালে শেফালি মায়ের নামে চিৎপুর কাঁপত। খুব বড় অভিনেত্রী ছিলেন। উনি যে দলের নায়িকা হতেন তাদের কাছে ভিড় জমাত নায়েকরা। প্রতিদিন শো। কী ডিমান্ড! এক সেসনই নাকি বোধহয় হয়েছে পাঁচ হাজার রাত। তারপর বয়স বাড়তেই মায়ের চরিত্রে চলে গেলেন। কিন্তু সেই চরিত্রটি হত পুরুষ প্রধান চরিত্র। সেইসময় প্রেমে পড়লেন শেফালি মা। পড়ে যাত্রা ছাড়লেন প্রেমিকের চাপে। কিন্তু প্রেমিকের হল ক্যান্সার। তাকে সারাতে নিজের জমানো টাকা জলের মতো খরচ করে গেলেন তিনি। সেই প্রেমিকের পরিবার ছিল অবস্থাপন্ন ভাল। তারা এক পয়সাও খরচ করতে চায়নি ওই প্রেমের জন্যে। মারা যাওয়ার আগে এই বাড়িটা শেফালি মায়ের নামে কিনে গিয়েছিলেন ওঁর প্রেমিক। তখন থেকে উনি চলে এলেন এখানে।' মাস্টারদা বলল, 'আর নয়। এবার ঘুমিয়ে পড়। সারাদিন অনেক ধকল গেছে।'

মাস্টারদা ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু নবকুমারের ঘুম আসছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল কলিকাতায় আজ তার প্রথম রাত। শেফালি মায়ের দয়ায় এই ঘরে শোবে, এখানে অন্ন জুটবে তা কিছুক্ষণ আগেও তার জানা ছিল না। ছুটকি, মন্দিরা, ওদের মা বাবাকে কি চিনতে পারত ট্রেনে না উঠলে!

রাত বাড়ছিল। ওপাশের ঘরগুলোতে গান বাজনা থেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে জড়ানো গলায় কোন মাতাল চিৎকার করে উঠছে। নবকুমারের মনে হল শেফালি মা যতই ভাল হোন এই পরিবেশে থাকা ঠিক নয়। যাত্রার গদিতে যদি থাকার ব্যবস্থা হয় তা হলে নিশ্চয়ই সেই জায়গা এখান থেকে অনেক ভাল হবে। হঠাৎ কানে চিৎকার, চেঁচামেচি কান্না ভেসে এল। তড়াক করে উঠে জানলার খড়খড়ি সরাতেই সে দেখতে পেল কালো ভ্যানে কিছু লোককে টেনে তুলছে পুলিশ। কয়েকটা মেয়ে পাগলের মতো চেঁচিয়ে গেল। তারপর ভ্যানটা চলে গেলে সব শান্ত কোন একটা লোক চিৎকার করে উঠল, 'জয় মা কালী কলকাত্তাওয়ালী। ঘুমা, এবার ঘুমিয়ে পড়।'

নবকুমার প্রথম রাতেই কলিকাতা-দর্শন শুরু করল।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

বেঙ্গল শ্রাচী হাউসিং ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। শ্রাচী টাওয়ার। ৬৮৬ আনন্দপুর, ই.এম. বাইপাস, রাসবিহারী কানেক্টর জংশন
কলকাতা ৭০০ ১০৭ ফোন ৩৯৮৪ ৩৯৮৪
www.shrachi.com

বহু বচ্চন

চলতি রহে জিন্দেগি

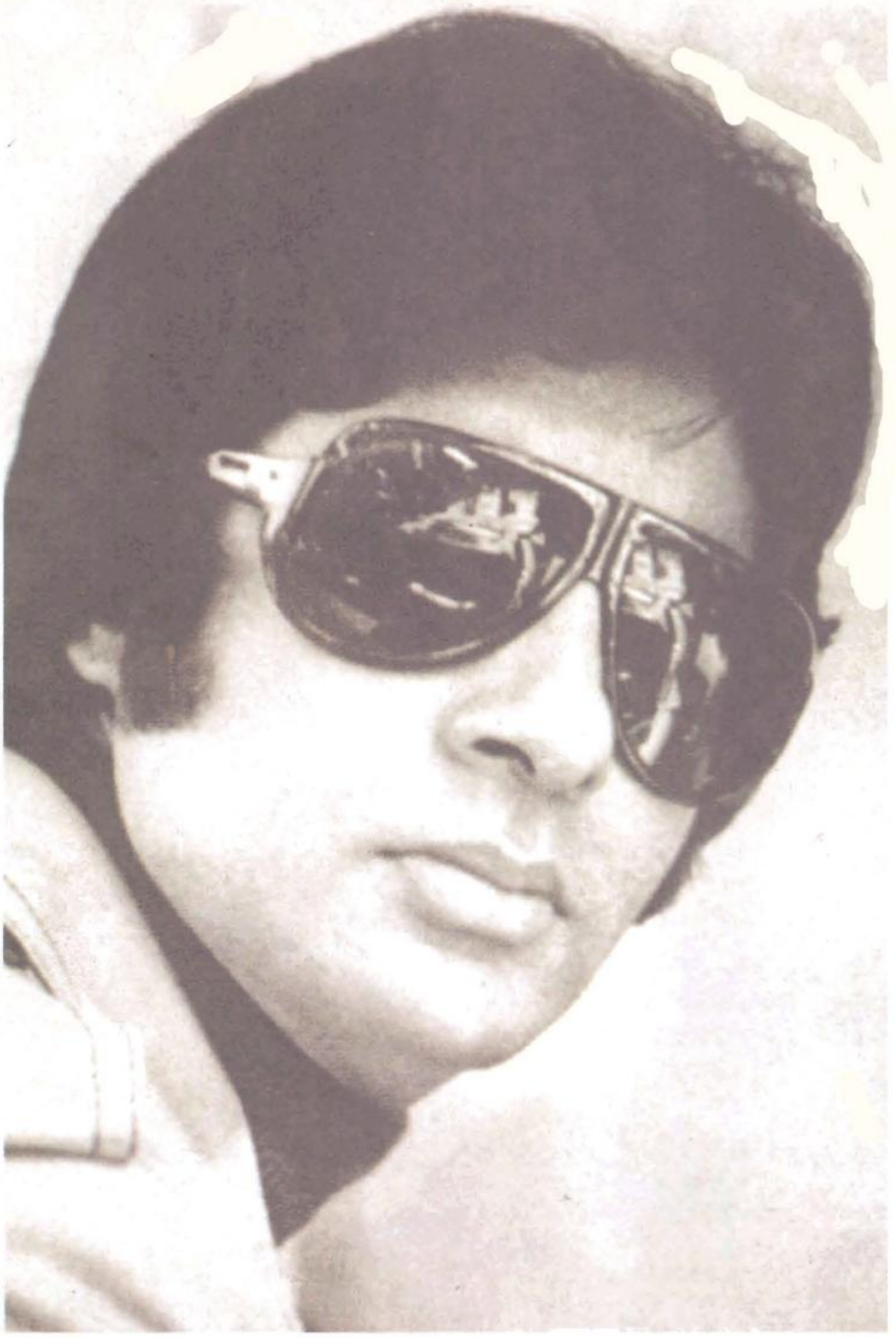

সিনেমার এক নম্বর নায়ক গ্র্যাজুয়েট হলেন কম্পার্টমেন্টাল ক্লিয়ার করে। শুরু হল ভাগ্যসন্ধান। কেরানির কাজের জন্য হাপিত্যেশ প্রতীক্ষা। অমিতাভর জীবনকথা

এপ্রিল মে পার হয়ে গেল। জুন মাসে ঘোর বর্ষা নামে কলকাতায়।
মোহনবাগান মাঠে উপচে পড়া দর্শকের ভিড়। মাঝে মাঝে
এসপ্ল্যানেড থেকে হাঁটতে হাঁটতে মোহনবাগান মাঠ অবধি আসি

বাবার সঙ্গে কবিতা পড়া

ষষ্ঠ দৃশ্য

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে বাবার বন্ধুর বাড়ি।
নামটা মনে পড়ছে না। কী..., যেন মিস্টার সারোগী।

বাবা বোধহয় ফোন করে দিয়ে থাকবেন। কিংবা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতেই আপাতত আমার প্রথম আস্তানা হল।

'দা স্টেটসম্যান'-ই তখন বোধহয় একমাত্র ইংরিজি কাগজ। সেখানে, আমি যে ধরনের কাজ খুঁজছি, তার বিজ্ঞাপন পেতে পারি। রোজ সকালে স্টেটসম্যান পড়াটা তাই রপ্ত করে ফেললাম। বলা যায়, আমার নিয়মিত কাগজ পড়ার শুরু সেই সেদিন থেকে।

প্রথমেই দেখি চাকরির বিজ্ঞাপন। সেগুলোয় দাগ দিই—-তারপর আস্তে আস্তে বাকি কাগজটা পড়ি। এবারে দাগ দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলো ধরে ধরে চিঠি লিখি। এই করতে করতে সকালটা কাটে।

দুপুর হলেই বেরিয়ে পড়ি। আগে কোথায় কোথায় চিঠি লিখেছি তার তাগাদা দিতে। এই অফিস, ওই অফিস। একটাই কোট আমার—কীরকম খয়েরি হলদেটে রঙ-এর। সেটাই যেন আমার ভিজিটিং কার্ড।'

এপ্রিল মে পার হয়ে গেল। জুন মাসে ঘোর বর্ষা নামে কলকাতায়। মোহনবাগান মাঠে উপচে পড়া দর্শকের ভিড়। মাঝে মাঝে এসপ্ল্যানেড থেকে হাঁটতে হাঁটতে মোহনবাগান মাঠ অবধি আসি। ফুটবল যত না দেখি, তার থেকে দেখতে ভাল লাগে এই সহজ, অকপট উদ্দামতা। এই অসম্ভব Joie De Vivre। পরে জেনেছি এই নামের এক কবি আছেন বাংলায়। জীবনানন্দ। তখনও তাঁর কবিতা তেমন ইংরিজিতে অনুবাদ হয়নি। বা হলেও, আমি দেখিনি। তবে শুনেছি খুব অন্যরকম একজন কবি। বাবাদের মুখে শুনে এসেছি উপমা যদি বলতে হয়—কালিদাস।

কলকাতার বন্ধুবান্ধবরা, যাদের কবিতায় আগ্রহ আছে (যদিও আমার তেমন বাঙালি বন্ধুবান্ধব বিশেষ হয়নি)

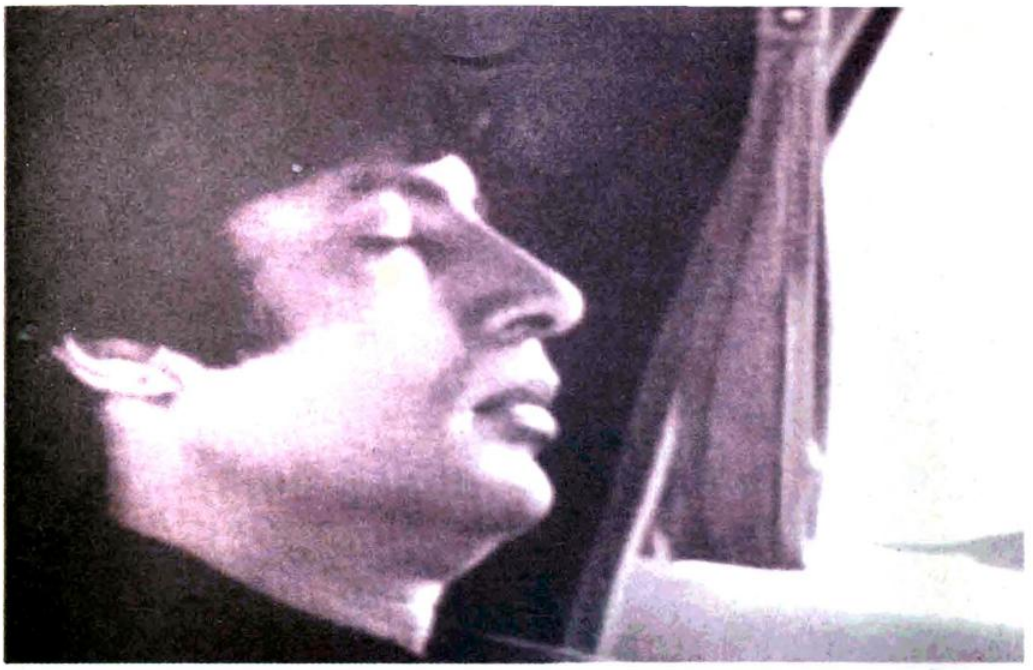

শুটিংএ যাওয়ার পথে গাড়িতে ঘুমিয়ে নেওয়া

দিল্লির, নৈনিতালের, এলাহাবাদের অনেক বন্ধুবান্ধব ইতিমধ্যে চলে এসেছে কলকাতায়। সবাই জানে এখানে এলেই একটা হিল্লে হয়ে যাবে। আবার আস্তে আস্তে চেনা পরিচিতরা ঘিরে ফেলছে আমায়। কাছে টেনে নিচ্ছে অচেনা শহর।

আর আমিও মনে মনে ভাবছি—শুধু একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলি! ব্যস্! বাকিটা তো বেশ। কলকাতাতেই না হয় কাটিয়ে দেব বাকি জীবনটা।

রেজিস্ট্রি ডাকে একদিন চিঠিটা এল। বার্ড অ্যান্ড হিলজার্স-এর একটা চিঠি। ম্যানেজমেন্ট ট্রেনির চাকরি। এমনিতে বার্ড অ্যান্ড হিলজার্স শিপিং কোম্পানি। আমার পোস্টিং হ'ল কোল (কয়লা) ডিপার্টমেন্টে-এ। ধানবাদে পাঠানো হল আমায় ট্রেনিং-এ। মাস তিনেক-এর জন্য। বুঝতেও পারিনি তখন, এরই মধ্যে আমায় কেমন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলেছে কলকাতা।

ধানবাদে ট্রেনিং-এ গিয়েও মন পড়ে আছে এই শহরটায়। আমার বন্ধুবান্ধবদের জন্য। কবে ফিরে আসব, তার অপেক্ষা।

তারই মধ্যে একদিন ঘটে গেল ঘটনাটা। সাইটে গেছি। সুপারভাইজর নিয়ে গেছেন। একটা কোল ফেস-এ। ফিরে আসবার জন্য সবে দু-এক পা বাড়িয়েছি। বিশাল একটা আওয়াজ।

পিছনে তাকিয়ে দেখি একটা বড় ধস নেমেছে।

দু'জন শ্রমিক চাপা পড়েছেন বোল্ডারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রিলিফ এসে গেল। শুরু হল উদ্ধারের কাজ। কাছেই যিনি ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে উদ্ধার আগে করা হবে, সেটাই নিয়ম। হুড়মুড় করে তাঁর কাছে পৌঁছোনো হল। তিনি কিন্তু বলছেন—আমায় নয়। ওর কাছে যান। আমি আর বেশিক্ষণ নেই। শ্বাস কষ্ট শুরু হয়ে গেছে। আমি এমনিতেই মরে যাব, বরং ওকে বাঁচান।

অন্য সঙ্গী তখনও একটু দূরে। বোল্ডারের নিচে।

ছোটবেলার পড়া যুদ্ধের উপন্যাস 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', উৎপল দত্তর 'অঙ্গার, ফিরে এল পরপর ফ্ল্যাশব্যাকে। আর ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডে, মানে ভবিষ্যতে কী হবে তার ঝলক পাওয়া তো এমনি জীবনে সম্ভব নয়, তা কেবল সিনেমাতেই হয়! নইলে হয়তো দেখতে পেতাম একদিন চাসনালা দুর্ঘটনা নিয়ে একটা হিন্দি ছবি তৈরি হচ্ছে, কালাপাথর, আমিই যার নায়ক!

(চলবে)

ব্যবহৃত সব ফোটোগ্রাফ জয়া বচ্চনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

Zenith
Diamond Jewellery
FORT KNOX
Unit-103(1st Floor)-6,Camac Street, Kolkata-700 017
Ph.-2282-7548,2282-7549

শীতের সাজে
সবার সাথে

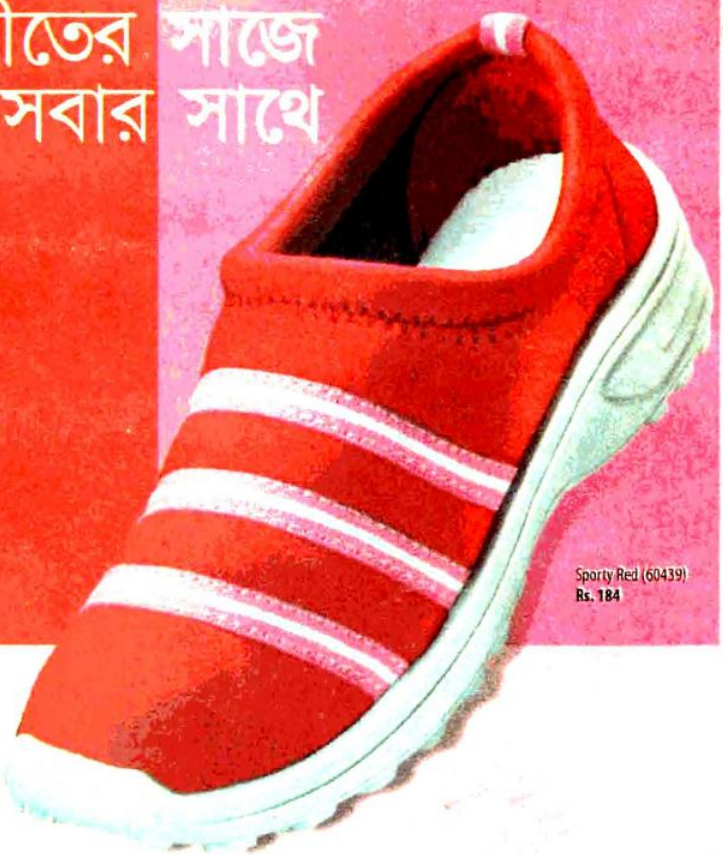

Sporty Red (60439)
Rs. 184

Sreeleathers
বিশ্বমানের খাঁটি দাম।

- লাইক্রা দিয়ে তৈরী হালকা ও আরামদায়ক
- শীতে পা থাকবে উষ্ণ ও শুষ্ক

Genesis 2287

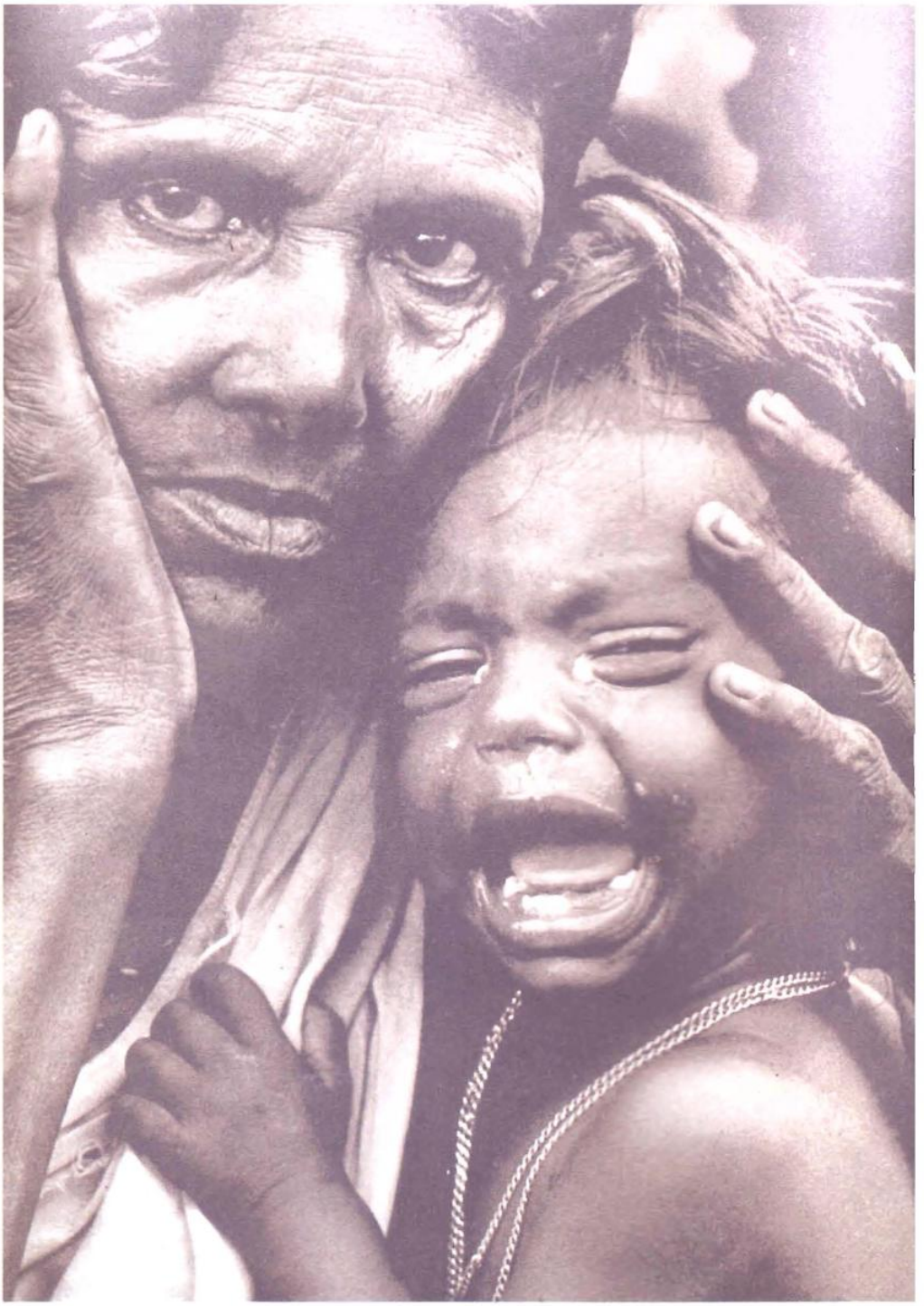

গঙ্গা যদি গর্ভে টানে

এ সংসারে যা হারিয়ে যায় যেন তারই কথামালা বড় যত্নে লিখে রাখে সাগরমেলা। সার দেওয়া ছাউনিতল, গরুর লেজ, বৈতরণী পারাপার—সব ছাপিয়ে ভেসে আসে ছিন্নমূল মানুষের কণ্ঠে রামপ্রসাদী তান। লিখছেন **সুব্রত মুখোপাধ্যায়**

ছবি: বিধানচন্দ্র রায়

'লয়ে যাবে গঙ্গাসাগর, সুখসাগর দেখাবে'—গানখানি যখন গোপাল উড়ে ভাসিয়ে চলেছেন সাগর সঙ্গমের লবণাম্বুরাশি বরাবর, এই মকর সংক্রান্তির কুয়াশা উতরোল সকাল হই হই কালে, তখনই মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, সিঙ্গুরের গোপাল ঠাকুরের মা, তুমি যেখানেই থাকো .... আমি তোমার ছেলে গোপাল, কোথা আছো গো মা...

এই যে স্নান সকালের আবছায়া আর মেলার আলো ঘিরে অগণ্য মানুষ, কুয়াশা ফুঁড়ে দূর লাইট হাউসের চোখ, দিগম্বর নাগা সাধুদের উল্লাস, হোগলার ছাউনিতে আগুন পোহানো, এসব সরিয়ে রেখে সিঙ্গুরের গোপাল ঠাকুর তার মাকে খুঁজছে। ঠিক সেই কালেই ঈশ্বরগুপ্ত খসখসিয়ে লিখে দিচ্ছেন, 'গঙ্গাজলে গঙ্গাজল অঙ্গ ধুয়ে আসি।' তারও কত আগে কূর্মপুরাণ বলে বসে আছেন, জল, স্থল ও শূন্য—গঙ্গাসাগরসঙ্গমে যে স্থানেই মরণ হোক না কেন মুক্তি হবে।

সাগরের জলে মুক্তির ইতিহাস লেখা আছে, সাতের দশক মুক্তির দশক, তারও কত না আগে যুগান্ত পাথার পার হয়ে, কত সংগ্রাম-লড়াই, মানুষের বাঁচা ও মরণের যাবতীয় মিথ, পুরাণ, মহাকাব্যকথা—এইসব। আসলে একমাত্র লোনা জলই তো লিখনের বা লেখমালার উপযুক্ত আধার। এ জলে কাগজ মিশে আছে। সে কাগজ আগুনে পোড়ে না। পোকায় দংশে না। মরণে তার মুক্তি লাভ হয় না।

সাতের দশকের কথা বয়ে এল—এই তো সেদিন বলেই বুঝি। সাগর জলে তার টাটকা আখর দেখতে দেখতে ভেসে এল এই সেদিনের কেশপুর, দাসপুর, পাঁশকুড়া লাইন। মারো মারো, হানো হানো, মানুষদিগে ঘরছাড়া করো, এলাকা দখল করো হে ভাইসব। গ্রাম দেশে যার যার—তারতার দুর্গ গড়ে তোল।তোমার লোক, আমার লোক—আমাদের লোক কেউ নয়। সেই নিয়মেই আবার সিঙ্গুর হল। নন্দীগ্রাম হচ্ছে। সাগর সে সব কথাই লিখে রাখছে তার মস্ত খোলা খাতায়। আর তার আশপাশ দিয়ে গোপাল তার মাকে খুঁজছে।

সমুদ্র তো কিছুই নেয় না। সবই ফিরিয়ে দেয়। যেমন ফিরে ফিরে আসছে এই সদ্য এখনটি তার নিভৃত ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। এ সংসারে যা হারিয়ে যায় তার কথামালা লিখে রাখে সমুদ্র, আমাদের ফেরত দেবে বলে। সেই নিয়মের, গোপালের ডাকের বিপরীতে গিয়ে, মনে হয় বুঝি বা কত না মা তাদের গোপালকে খুঁজে ফিরছে। এলাকা দখলে, মাটির স্বধর্ম বিচ্ছেদে, মাটি তার অমূল্য নিধিত্ব সম্বল করে পথ ভুলতে বসেছে। অথচ এক মুঠি মাটিও জানে—বেচা-কেনার সংসারে তার কোনও দাম হয় না। মাটিই একমাত্র সত্য, যেমন সত্য মানুষ।

সাগরের কাগজে লিখন দেখা যায়, সেই কবেকার কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রীয় প্রকরণে উন্নয়ণের তিনটি বার্তা রেখেছিলেন। কৃষি, (গবাদি) পশুপালন আর বাণিজ্য। এই বার্তা বা মহাবিদ্যা কৃষক-শ্রমিকের উপকারি। রাজা স্বয়ং এদের পরিচালক। রাজধর্মের সঙ্গে কৌটিল্যের দণ্ডনীতি ভারী বিচক্ষণ আর মহামহিম সামবাদী। অথচ গুজরাতের গোধরা কাণ্ডের কালে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজধর্ম পালনের কথা বলেছিলেন। তাই করেছিলেন মোদী।

এ বছর গঙ্গাসাগরে মানুষ সমাগম যথেষ্ট কম, প্রয়াগের অর্দ্ধকুম্ভের হাত বাড়ানোয়। তবু তারই মধ্যে যার যেমন ক্ষমতা—তীর্থ হল, বাণিজ্য হল। এমনকি শিল্পায়ন চিন্তাও কম হল না। এরই মধ্যে সাগরদ্বীপ ভাঙনের গ্রাসে পড়ে চারিধার থেকে ক্ষয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র তিল তিল এগিয়ে যাচ্ছে, পনের বছরে এক -দেড় বর্গ কিলোমিটার হ্রস্ব হয়েছে সে। সেই ক্ষয়ে যাওয়া সংসারের মাঝখানে সাগর

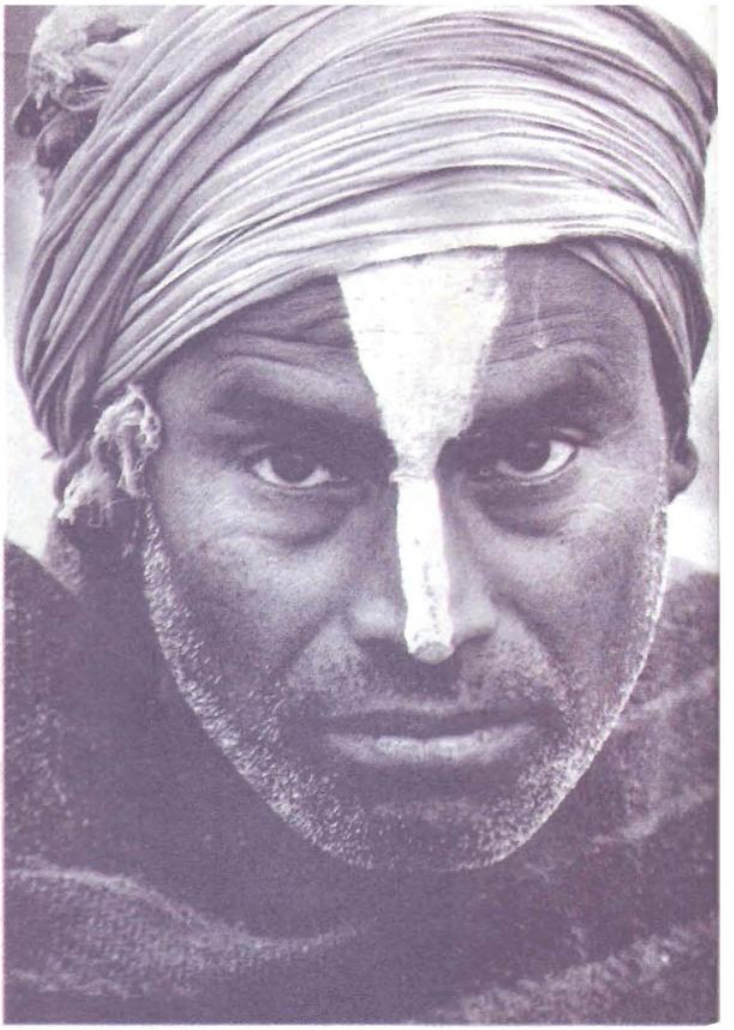

মৌজার এক মাত্র আট-ন বছরের বালক সুভাষ পড়ুয়া একটু একটু করে বাড়তে চাইছে। তার বাবা সুধন্য পড়ুয়া তাকে মেলা খরচা দিয়েছিল কুড়িটি টাকা। সেই টাকায় ছেলে দিব্যি বেশ ক-আঁটি খড় কিনল। এক এক আঁটি খড়কে দু-ভাগ করল। তারপর মেলায় হোগলা ছাউনিগুলিতে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে পেয়ে গেল চল্লিশ টাকা। ঠাণ্ডায় তীর্থযাত্রীরা ওই খড়-বিচালি পেতে শোবে। সেই দু-কুড়ি নিয়ে সুভাষ বসে না থেকে আবার প্রক্রিয়া শুরু করল! আবার দু-ভাগে ভাগ। আবার বিক্রয়। এই করতে করতে সে যেখানে থামল তার দাম আটশো টাকা। মাত্র কুড়ি টাকা বিনিয়োগ করে আটশো। এই বালকটির অর্থনীতি ও সমাজ চিন্তার কোনও তুলনা আছে কি? কে বলতে পারে—এখান থেকেই তার শিল্পভাবনা সিধে আকাশে উঠে যেতে পারে। সাগরের দেদার খাতা সে কথা লিখবে বৈকি।

সমাচার দর্পণ-পত্রিকা ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ লিখছেন, 'গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া বসতি করাইলে উপকার এই প্রথম সেখানে অত্যুত্তম প্রকার তুলা জন্মিতে পারে।'

এখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছে জাহাজ মেরামতি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব, কলকাতা থেকে ইংলন্ডে জীবজন্তু প্রেরণের সুবিধার্থে সাগর দ্বীপে পশুদের জমাঘর তৈরির চিন্তা ইত্যাদি। ইতিহাস মোতাবেক কাগজের সব প্রস্তাব শাসকগণ নেক নজরে দেখেন না বলেই এমন অনেকানেক ভাবনা সাগরের জলে গেল। কিন্তু বাঙালির শিল্পভাবনার সেই কবেকার একখণ্ড নমুনা তো চোখে এল। তাহলে এই কমপিউটার তাড়িত কালে রাজা কেন কর্ণেন পশ্যতি হবেন!

'দর্পণপ্রকাশক' গঙ্গাসাগর জড়িয়ে একখণ্ড বিচিত্র সমাচার তুলে দিলেন সাগরের হাতে ২৭ নভেম্বর, ১৮৩০ সালে। বললেন, '.....বাবু রামমোহন রায় সতী বিষয়ক এক দরখাস্ত পার্লিমেন্টে দেওনার্থ সমভিব্যাহারে লইয়া বিলায়তে গিয়াছেন। উক্তবাবু যে জাহাজে, গমন করিয়াছেন তাহা এইক্ষণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।' দর্পণ আরও জানাচ্ছেন, বাবুকে বিদায় দিতে সেই আলবিয়ন নামক জাহাজে তাঁর কিছু ইয়ারদোস্ত কলকাতা হতে গঙ্গাসাগর তক্ গিয়েছিলেন। অতএব বুনো সাগরদ্বীপ এককালে আর এক বন্যপ্রথার মুখে চাপড়মারা এক মানুষের ছোঁয়া পেয়েছিল, এ কথা এই মেলার প্রভাতে ভারী মনোহর। আর মনোহর 'সমুদ্রগত' কথাটুকু। আর চমৎকার, পাণ্ডববর্জিত বলে অসত্য নিন্দিত এই বঙ্গের সাগরদ্বীপ ঘিরে প্রবল মিথ যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচপাণ্ডব এ স্থানে মকরস্নানে এসেছিলেন। কিন্তু মিথ কল্পনা আরও প্রবল হয় যখন প্রত্যক্ষ শুনি রামমোহনি সমাচার। তিনিই বা কম কিসে!

সাগর মেলার ভীড় সমাগম এড়িয়ে—জল থেকে কিছু তফাতে সাড়ে তিন হাত উঁচু আন্দাজী এক জোড়া হোগলা ছাউনি তলে পাশাপাশি দুটি পরিবার। সকলেই পরমগৃহী হলেও এখন গেরুয়াধারী। এমনকী মেয়ে-মহিলারাও । আসলে গেরুয়া মানে মহা টিকিট। কোথাও ভাড়া লাগে না। তবে সামান্য ব্যত্যয় আছে সর্বত্যাগী দিগম্বর নাগা সাধুরা বাদে অন্য গেরুয়া বা রক্ত পীতগণ সামান্য পাঁচটাকা মতন তীর্থযাত্রী কর দিতে কবুল। যেতে যেতে, এমনই ঊষাকালে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় ছাউনির সামনে। এক গেরুয়া বৃদ্ধার কপালে তিলক সেবা আর হাতে খঞ্জনি। তাঁর পাশে এক বাবরিচুলো প্রৌঢ়র কোলে শ্রীখোল। বাদবাকিরা তালে-বেতালে, হাততালি। গান হচ্ছে, রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম...। মেলায়, গেরুয়া সম্মিলনে, এই প্রথম শোনা হল রামধুন। বাউল, হরি সংকীর্তন সরিয়ে রেখে এমনতর গান বেছে নেওয়ায় প্রথমে অবাক হলেও পরে মর্মকথা টের পাওয়া গেল আমার নিজের মতন করে, মনেরই ঘুর পথে।

কিছুদিন আগেই গান্ধিমূর্তির পাদদেশ থেকে নেত্রী প্রায় ভান্ডি অভিযানের ধাঁচে সিঙ্গুর যাত্রা করার শপথ নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবো।' আবার—তারপর নন্দীগ্রাম ঘটার পর এক প্রবীণ নেতাও প্রকাশ্যে মার-এর নির্ঘোষ দিলেন। প্রথমত গান্ধি এবং রক্তগঙ্গা, পাশাপাশি কি যে মনোহর! গান্ধি এদেশে যে কতবার মরবেন তা কে জানে! বস্তুত, গান্ধি আর রবীন্দ্রনাথ এতই সহজলভ্য নমুনা ও আশ্রয় যে এঁদের কোনও জুড়ি হয় না। যে যেমন পারে খাবলে খুবলে নেয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মরণোত্তর দেহ দান না করলেও ভক্তগণ তাঁর শবদেহের থেকে চুল-দাড়ি উৎপাটন করেছিল স্মৃতি রাখবে বলে।

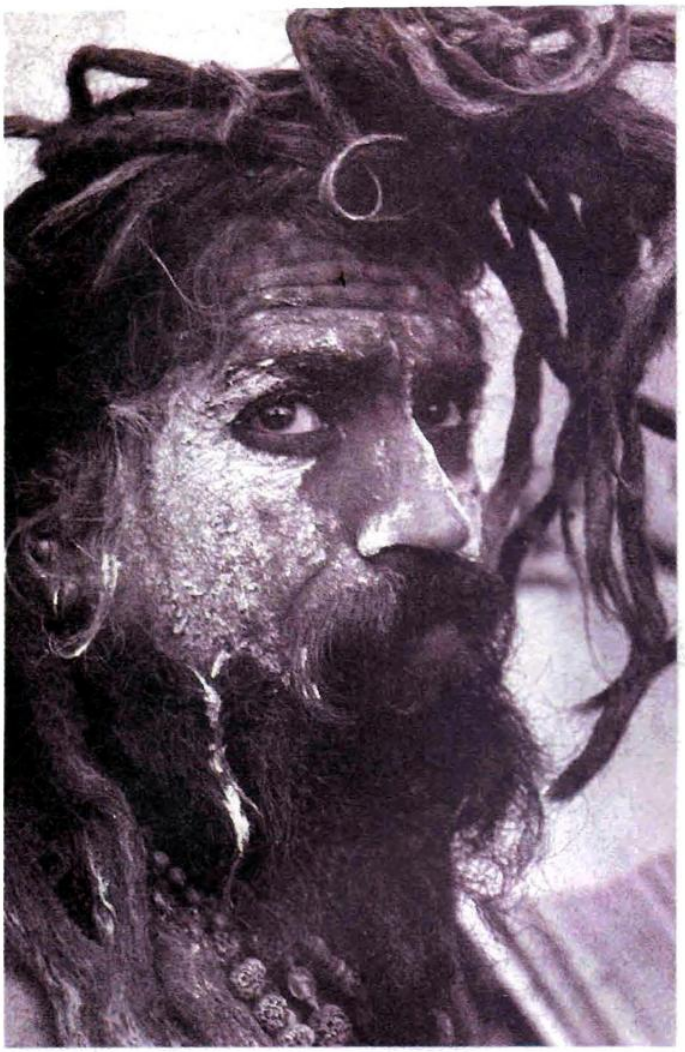

কিন্তু এই গঙ্গাসাগর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ওঠে, কে মারছে কাকে? কারা লেলিয়ে দিচ্ছে মারকের পাল? সেই সব অসহায় রক্ত স্রোত কি এ সঙ্গমে এসে মেশেনি? অতএব, মকর সংক্রান্তির পবিত্র পাপস্খালন নাকি বিশুদ্ধ স্নান কালে এই অভিনব রামধুন যে কী তাৎপর্যময়।

আহা, ছাউনিতলের মানুষগুলির মুখে কি শান্তি লেখা। তবু, একটি কথা না বললে হয় না। হোগলা ছাউনিগুলির উচ্চতা মেরেকেটে সাড়ে তিন হাত। তার মধ্যে বসেই তারা শান্তি খুঁজছে। আসলে বুঝি তারা সবাই জেনে বসে আছে, যে মারছে আর যে মরছে দুজনের জন্যেই অন্তিমে মাপা আছে সেই সাড়ে-তিনহাত জমি।

এই দার্শনিক ফুঁ-এর বাইরে সাগর জলে একের পর এক গরুর পুচ্ছ পাকড়ে মানুষ বৈতরণী পার হয়ে চলেছে। পার হচ্ছে তথাকথিত যমদ্বার। আলিপুরের বাচ্চু পাণ্ডা স্থানীয়ভাবে তিনশত টাকায় বকনা বাছুরটি ভাড়া করে নরাধমদের পার করাচ্ছে এক হাঁটু প্রমাণ জলে দাঁড়িয়ে এবং আধাখেঁচড়া সংস্কৃত আউড়ে, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু... জম্বুদ্বীপে. ভারতখণ্ডে, গো-দান মহাকল্যাণ,....সম্প্রদয়ে। কাজ অন্তে দক্ষিণা মিলছে পঞ্চাশ থেকে একশো-দেড়শো। ভাড়া করা বকনা উপবিনিয়োগ করে বাচ্চু পাণ্ডা তাহলে মন্দ রোজগার করছে না। কমলাকান্তের গরু কার প্রশ্নটি আরও একবার কূট অভিঘাত পেতে পেতে বুঝি সামলে নেয়। শিল্পায়নের কোনও গোমুখী তত্ত্ব আছে কি? কেননা গরু তো মাঠে চরে। ঘাস-পাতা খায়।

সাগরমেলায় জুনাপুরের নাগা সাধু লবণ জলের এসব তত্ত্ব বোঝেন না। ছাইভস্ম মাখা দিগম্বর বৃদ্ধ সামনে কাঠ জ্বেলে সরকারি খোপে বসে অহর্নিশি আগুন তাপাচ্ছেন, আর সামনে সারবন্দি মানুষের ব্রহ্মতালুতে আশীর্বাদী হস্ত রাখছেন। সাধুর কাছে প্রার্থী বিস্তর। অমুক চাই, তমুক চাই। হেন দাও, তেন দাও। ফলে সাধু হাত তুলে বলে উঠছেন, আনন্দ রহো। আনন্দ রহো। অঙ্গে পোশাকের বাঁধন নেই সন্ন্যাসীর কাছে এ ছাড়া আর কি বা দেওয়ার আছে। আনন্দের স্থূল কোনও বাস্তবতা না রইলেও মনের জটিল ভুবনখানি তো পাতাই আছে। সেই নিয়মেই তীর্থে তীর্থে মানুষ বুঝি কল্পতরু চায়। কিন্তু সবাই তো রাজা হয় না।

মেলায় প্রৌঢ় ছেলের কাঁধে বৃদ্ধা মার চোখে ছানি কাটানো কাঁচ পাথর চশমা। উত্তরদেশীয় এই মা বিস্ফারিত চোখে ফুটি ফুটি আকাশ দেখছে, দেখছে সংক্রান্তির নিরুত্তাপ ঢেউ। চৌদিকে খোল-করতাল-ঝাঁঝর বাজছে। তারই মধ্যে পাঁজাকোলা মাকে মকর স্নান করাচ্ছে সন্তান। ছেলে ভাবছে মার কাঠামোর ওজন ভারী কম নয়। মা বলছে, আমার সন্তান যেন দুধেভাতে রয়।

গঙ্গাদ্বার হরিদ্বার থেকে এই গঙ্গাসাগর—অতিদূরস্থান দুধারে। পাহাড় থেকে ভূমিতে অবতরণ করে গঙ্গা এখানে এসে লয় হন। তাঁর একাকীত্ব মুছে গিয়ে মহাবারিধিতে বহু হন। এই বহুত্ববাদী তত্ত্ব সাগর মেলার কুয়াশা পাথারে কেবলই বুঝি মানুষ খোঁজে। সেই মানুষগণ সবাই হয়তো গঙ্গাবতরণের মিথ জানেন না। জানার প্রয়োজনও নেই।

আসলে মানুষই তো ভগীরথ। সেই তো মৃত্যু হানে। জীবন রচনা করে। সে এই সাগর সঙ্গমে ফুল, নারিকেল ভাসায়। পঞ্চরত্ন অঞ্জলি দেয়। মন্দিরে প্রায় বিমূর্ত সিঁদুর মাখা কপিলমুনি বৃহৎ বিস্ফারিত চোখ চেয়ে দিবানিশি এইসব দান প্রত্যক্ষ করেন। সেবাইতরা গাঁঠরি গোছায়। স্তূপীকৃত টাকা, সোনাদানা। মেলা শেষে তারা ফিরে যায় অযোধ্যায়। সেখানে অপেক্ষা করে আছে হনুমান গেড়ির আখড়া। এখানে এসে মনে প্রশ্ন হয়, কপিলমুনির ওই নিরেট মূর্তিখানিও কি সচল এক বিনিয়োগ!

বড় নদী বা মুড়িগঙ্গায় ফিরতি অপরাহ্নে কী বিষম জোয়ার। সেই জোয়ারে জোয়ারে নদীভাঙনের বাস্তবতা ভেসে আসে। মালদহ, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ—আরও কত না ভূমিখণ্ডে গঙ্গা ভাঙনে ব্যস্ত। কত মানুষ ঘরছাড়া, ভূমিহারা। কুঁড়েঘর, দালানকোঠা, মন্দির, মসজিদ—সবই গঙ্গা দুহাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিচ্ছেন। কোথায়, কখন নিদান জারি হচ্ছে তার আগাম খবর কেউ জানে না।

দেশকালে ভাঙন হচ্ছে, শিল্পায়ন ঘটছে। আর এই অবসরে কুমারহট্ট হালিশহরের গঙ্গাতীরে বসে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন গাইছেন

গঙ্গা যদি গর্ভে টানে,
লইল এই ভূমি
কেবল কথা রবে, কোথা রব,
কোথা রবে তুমি...

সে
সেন
সলিউশনস

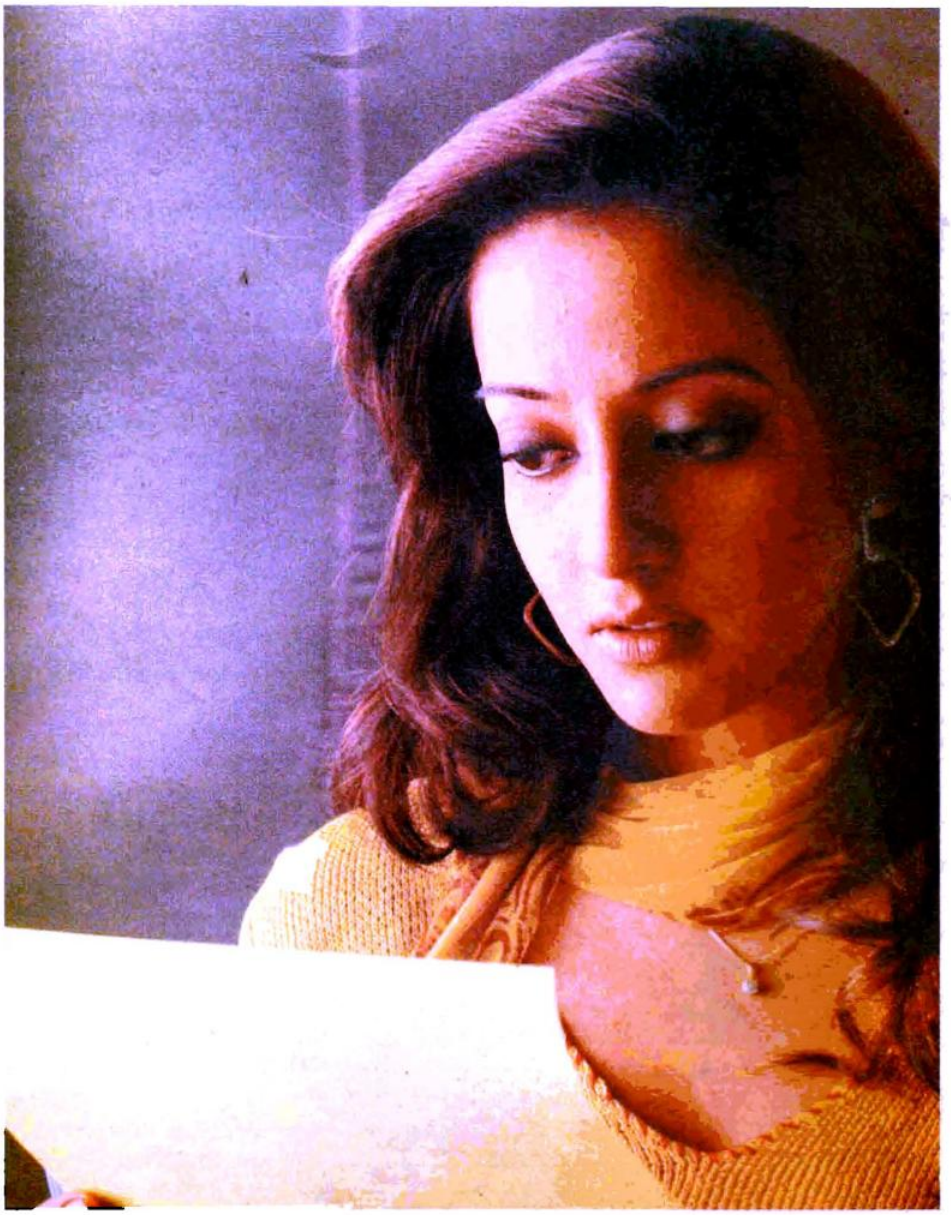

অনেক চিঠি আসছে। অনেক প্রশ্ন? কিন্তু রোববার-এর বরাদ্দ দুটো মাত্র পাতা। তাই বেছে নিচ্ছি দুটো করে প্রশ্ন। একটা সাহায্য করবে আমাকে? মূল সমস্যাটা একটু ছোট করে যদি লেখো, প্রশ্ন হিসেবে সেটা ছাপানো যায়। দরকার হলে সঙ্গে সেটাকে ইল্যাবরেট করে একটা চিঠি দাও। আমার বোঝার জন্য।

বেশিরভাগ সময় কলেজের বন্ধুরা ইংরেজিতে কথা বলে। স্কুলে ইংরেজি বলার অভ্যেসটা একেবারে ছিল না। বাড়িতেও একেবারেই চর্চা নেই। তবে সবসময় ভাবতাম যেটা জানি, ঠিক জানি। ইদানিং এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারছি যে এতদিন যা জানতাম তার বেশিরভাগটাই ভুল। আসলে বন্ধুটির বিষয় ইংলিশ অনার্স আর ওর ইংরেজি বলায় কোনওঁ জড়তা নেই। বুঝতে পারি যে সব থেকে বড় সমস্যা হয় ঠিকঠাক উচ্চারণ না করায়। প্রথম দিকে অন্যরা ভুল ধরিয়ে দিলে ভীষণ রাগ হত। মনে হত ওরা কে, যে আমার ভুল ধরাবে? ইদানিং কলেজের এক প্রফেসার আমায় ওদের মতো একই কথা বললো। এর ফলে ইংরেজি বলতে গেলেই আজকাল খুব আড়ষ্ট হয়ে যাই। আর ভয় হয় যদি অন্যদের হাসির পাত্র হয়ে যাই। কী করব?

সিদ্ধার্থ ভৌমিক, কলকাতা-২৪

তোমার প্রবলেমটা তুমি নিজেই সল্ভ করতে পারো।

এমনও হতে পারে যে নিজের আগের কোনও তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য ছেলেদের সঙ্গে তোমার মেলামেশার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি।

দু'টো উপায় রয়েছে। প্রথমত তুমি তোমার কলেজের বন্ধুদের মধ্যে যে কোনও একজন ভাল বন্ধু বেছে নাও যাকে তুমি তোমার সমস্যাটা খুলে বলতে পার। সে যদি সত্যিই ঠিক ইংরেজি জানে এবং তোমার ভুল কারেক্ট করতে সাহায্য করে তাহলে তো আমি মনে করি তোমার সেটা স্পোর্টিংলি নেওয়া উচিত। আফটারঅল ওর হয়তো চিরদিনই ইংরেজি বলার একটা অভ্যেস ছিল। আর তাই ইংরেজি ভাষায় অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। হতেও তো পারে যে ও তোমার মতো বাংলা ভাষায় কনফিডেন্ট নয়। সহজে ঠিক ইংরেজি উচ্চারণ শেখার আর একটা উপায় হল টিভিতে ইংরেজি নিউজ চ্যানেলগুলো দেখা। বিশেষ করে বিবিসি, সিএনএন আর এনডিটিভি। যখনই সময় পাবে, পারলে এই চ্যানেলগুলো দেখো। আর ওখানে কীভাবে ইংরেজি উচ্চারণগুলো করছে সেটা মন দিয়ে শোনো। বারবার শোনো। মন দিয়ে ঠিক উচ্চারণ শোনাটা কিন্তু সবথেকে ইমপর্টেন্ট। দেখবে তুমি খুব তাড়াতাড়িই ঠিক উচ্চারণটা ধরে ফেলতে পারছ। একটা কথা সত্যিই ভুললে চলবে না, যে কোনও ভাষা ঠিকঠাক বলতে গেলে সবথেকে আগে সেই ভাষাকে ভালবাসতে হবে। বন্ধুদের মতামত একটু স্পোর্টিংলি নাও। আর অনবরত ইংরিজিতে কথা বল। ভুল হোক, ঠিক হোক—বল। না বলতে থাকলে কিন্তু ইংরিজি বলার অভ্যেস কোনওদিনও হবে না। কেউ ভুল ধরবে ভেবে আড়ষ্ট হয়ে থেকো না। আর যদি ভাবো, সব ভুল শুধরে নিয়ে তবে বলা শুরু করবে, তাহলে কোনওদিনই বলে উঠতে পারবে না। কারণ ভুল করতে গেলে তো ইংরিজী বলতে হবে। নইলে ভুল করবে কী করে?

সব সময় মেয়েদের স্কুলে পড়েছি। কলেজ কো-এডুকেশন। মা সব সময় মনে করে আমি ছেলেদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব না। ছেলেরা হয়তো আমায় এসে বিরক্ত করবে। এই ধারণা নিয়ে মা আমায় সারাক্ষণ কড়া নজরে রাখে। হ্যাঁ সত্যি! বন্ধুদের সঙ্গে কলেজ থেকে সিনেমা গেলে মা হলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকে। সিনেমা থেকে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় গেলে মা বাইরে ওয়েট করে। তারপর বাড়ি ফিরে এলে আমায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় গেছিলাম? কাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম? যেন মা কিছুই জানে না। বন্ধুরাও মাকে দেখতে পেয়েছে। ওদের কাছে এটা খুব সারপ্রাইজিং। মা-কে বোঝালে, মা এড়িয়ে যায়। মা ভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশলে আমার ক্ষতি হবে। এতে আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। মার ক্রমশ এটা একটা বাতিক হয়ে যাচ্ছে। কী করা যায় বলো তো?

পারমিতা সাহা,কলকাতা - ৭১

তোমার মা-কে বোঝানোর দায়িত্ব এখন তোমার নিজের হাতে। বড় হয়েছ। কলেজে পড়ছ। একদিন তোমার কোনও পরিচিত কফি জয়েন্টে তুমি মায়ের সঙ্গে একটু সময় কাটাও। মাকে সাহায্য করো চারপাশের পরিবেশে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মেলামেশার সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি করতে। প্রথম প্রথম মার একদমই ভাল লাগবে না। হতে পারে বিরক্ত হয়ে তোমাকে নিয়ে কফি জয়েন্ট থেকে বেরিয়ে আসবে। তাতে ক্ষতি নেই। কয়েকদিন পর ঠিক এরকমভাবে মা-কে নিয়ে দু-একজন কাছের বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখো। মাকে বুঝিয়ে দাও, তোমাদের জগৎটা আসলে একটা স্বাভাবিক জগৎ। দরকার হলে, তোমার কাছের বন্ধুদের সাহায্য নেবে। মাকে বলবে, মা না গেলে তুমিও যাবে না। আস্তে আস্তে মা তোমার কাছ থেকে একটা নতুন সঙ্গ পাবে। যেটা তার অজানা। এবার তোমার কলেজের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দাও। প্রথমে বাইরে তারপর বাড়িতে ডাকো। তবে হ্যাঁ, তারা যেন সেন্সিবেল হয়। মনে হয় তোমার মা-র ছেলেদের নিয়ে বা তোমার সঙ্গে তাদের মেলামেশা নিয়ে কোনও ভুল ধারণা রয়েছে। এমনও হতে পারে যে নিজের আগের কোনও তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য ছেলেদের সঙ্গে তোমার মেলামেশার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি। ফলে একটু তো সময় লাগবে। আর এ ধারণাটা হয়তো তাঁর অনেকদিনের। মা কিন্তু ভাবছেন উনি তোমার ভালর জন্যই এগুলো করছেন। তোমার অসুবিধেটা মার বুঝতে একটু সময় লাগবে। যেমন মার অসুবিধেটা তোমার লাগছে। একটু ধৈর্য ধর।

সব কথা হয়তো বাবা-মাকে বলা যায় না, বলা যায় না প্রিয় বন্ধুকেও। বরং নির্দ্বিধায় জানাও রাইমাকে। ঠিকানা লিখো—সেন সলিউশনস, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২

চেখেছে রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা ছানা

কাঁচা ছানা পাকা মাথা শীতের আয়েস নলেন পায়েস রসনা বন্দি নকুড় নন্দী—
ছানাছন্দে লিখলেন **অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়**

শ্বশুরমশাই গিরীশচন্দ্র দে মৃত্যুশয্যায়। উড়নচণ্ডী জামাই নকুড়চন্দ্র নন্দীকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। শেষমেশ খোঁজ মিলল জামাইয়ের। বাড়ির চৌবাচ্চায় একগলা জলে চুপটি করে বসে রয়েছেন। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাড়ির চাপে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই মিষ্টান্ন ব্যবসাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন। নিশ্চিন্ত শ্বশুর চোখ বুজলেন, নকুড় নন্দী আসরে নামলেন এবার।

বাঙালির সন্দেশশিল্পে এরপর থেকে যাবতীয় তুলির আঁচড় ওই নকুড়েরই। কাঁচা ছানাকে কাঁচা সোনার পর্যায়ে তুলে আনার যে সূক্ষ্ম কেরামতি, তার কৃতিত্ব পুরোপুরি এই শিল্পীর। ১৮৪৪-এ সিমলেপাড়ায়, বিবেকানন্দের বাড়ির দোরগোড়ায়, রামদুলাল সরকার স্ট্রিটে (তখন নাম ছিল মানিকতলা স্ট্রিট) এই দোকানের জন্ম। দোকান বলতে তখন একটি [illegible]। কিন্তু তারই খ্যাতি একটু একটু করে ছড়াতে থাকে।

ভোলা ময়রা তখনও বেঁচে, বাগবাজারের বারুদখানায় তাঁর দোকান। ১৮৫১ সালে ভোলা ময়রা গেলেন। গিরীশের সন্দেশের খ্যাতি আরও বাড়তে লাগলো। কলকাতায় মানুষ তখন দুজনকে একডাকে চেনে—নাটকে গিরিশ ঘোষ, সন্দেশে গিরীশ দে। [illegible] রবীন্দ্রনাথ গিরীশের সন্দেশ খেয়ে বিগলিত। তিনি বললেন, 'সন্দেশ বাংলাদেশে বাজিমাত করিয়াছে, যা ছিল খবর বাংলাদেশ তাকেই সাকার বানিয়ে করে দিল খবর।' কবিগুরুর মতে এ যেন 'সাকার-নিরাকারের শিবশক্তি মিলন।'

এই মিলনেরই অপার্থিব স্বাদ নকুড়ের প্রতি সন্দেশে। আজও। নকুড়ের অনন্যতা এখানেই, সে আর পাঁচটা দোকান নয়, সে সন্দেশ ছাড়া কিছু বানায় না। তাই সে

অভিজাত আর একক।

এখন দোকান চালান তিন ভাই, প্রতাপ, প্রশান্ত ও প্রণব নন্দী। প্রশান্তবাবু জানালেন, দোকানটা চালু করেন কিন্তু গিরীশ দে'র বাবা মহেশ দে। কিন্তু শ্বশুর-জামাই 'কম্বিনেশন'কেই মনে রেখেছে বাঙালি বেশি করে। কিন্তু দোকানটা তো হালে পরিচিত নকুড়ের নামেই? প্রশান্তবাবু ধরিয়ে দিলেন কারণটা।

নকুড়চন্দ্র নন্দী শুধুমাত্র মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন মিষ্টান্নশিল্পী। ছানার মিষ্টিকে আরও কীভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় সারাক্ষণ চিন্তাভাবনা করতেন তাই নিয়ে। আগে বাঙালির সন্দেশ বলতে বোঝাত 'চিনির ভেলার সন্দেশ।' স্বামীজির ভাই ভূপেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়, একবার বিয়ের ভোজে গ্রামের লোকেদের পাতে কলকাতায় তৈরি সন্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা খেয়ে হইচই করতে লাগলো। বলল, পানসে সন্দেশ, ব্যাটা ময়রা মিষ্টি দিতে ভুলে গেছে। তখন পাতে একহাতা করে গুড় দেওয়া হল। তাই দিয়ে মেখে সবাই ওই সন্দেশ মুখে তুললো।

আপামর বাঙালির এই মিষ্টি স্বাদের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোই নকুড়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। প্রকৃত শিল্পীর পরিমিতিবোধ তাঁর সন্দেশে। ছানা চিনির মণ্ড থেকে বাহারি সন্দেশ বানানোর পরীক্ষানিরীক্ষাই তাঁকে চিরকালীন করে তুলেছে।

এই আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হইনা কখনও, বললেন প্রতাপবাবু। আরও নতুনরকম, নতুন স্বাদ কীভাবে তৈরি করা যায় তা নিয়ে বাড়ির সবাই ভাবেন। প্রত্যেক বছর বাঙালিকে নতুন মিষ্টি উপহার দেন তাঁরা। প্রশান্তবাবু জানালেন, গতবার করেছিলাম নলেনগুড়ের রাবড়ি, এ বছর করছি নলেনগুড়ের ছানার পায়েস। এ দোকানে নলেনগুড়ের গন্ধই আলাদা। কোথা থেকে আসে? কৃষ্ণনগর। নদিয়া জেলার মতো নলেনগুড় আর কোথাও হয় নাকি! ওখান থেকেই ফি-বছর দিয়ে যায়। আর এই শিল্পের মূল কাঁচামাল, ছানাটা আসে কোথা থেকে? ছানা নিজেরা কাটাই, নির্দিষ্ট কিছু গোয়ালা আছেন। যোধ সিং, ওমর মিঞা। তাঁদের থেকেই দুধ কিনি।

প্রত্যেক সন্ধেয় নকুড়ের দোকানের ভিতরে কাঠের তাড়ুতে ছানার তদারকি—সে এক দেখার মতো দৃশ্য। প্রায় সন্তানস্নেহে ময়রারা যেন দুহাতে সামলাচ্ছেন একরাশ শরত মেঘ।

নকুড়ের নলেনগুড়ের ছানার পায়েসের বিশেষত্ব এখানেই, এটি সম্পূর্ণভাবে কাঁচা ছানা দিয়ে তৈরি, পাক দেওয়া ছানা নয়। ফলে এ ছানা নরম ও স্বর্গীয়। নকুড়ের আদি ও অকৃত্রিম জলভরা নরমপাক, (সত্যজিৎ রায় মিষ্টি বলতে এটিই বুঝতেন) মৌসুমী, সৌরভ, হালফিলের মোহিনী—এসব তো আছেই হাতের পাঁচ, এ বছরের জন্য নকুড়ের উপহার—নলেনগুড়ের ছানার পায়েস। প্রিয়জনকে খাওয়ালে, আহা— চেখেছে রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা ছানা—হলফ করে বলতে পারি ভুইফোঁড় কেক-পেস্ট্রি-স্যুফলেকে যে কোনওদিন তিনদিন জেল সাতদিন ফাঁসি টাঙিয়ে দিতে পারে নকুড়!

আড়াই কেজি ছানার পায়েস করতে লাগবে

দুধ	৮ কেজি (চার কেজি পায়েসের জন্য, চার কেজি ছানা বানাবার জন্য)
পাতিলেবু	২টো
পেস্তা	১০০ গ্রাম
পাটালি গুড়	স্বাদমতো

এবার

প্রথমে চার কেজি দুধ ফুটিয়ে তাতে দুটো পাতিলেবুর রস দিয়ে ছানা কেটে নিন।

এরপর দুধ ঘন করুন, বাকি চার কেজি দুধকে দেড় কেজি বানান।

দুধ ঠাণ্ডা হলে এরমধ্যে সদ্য-কাটানো নরম ছানা দিয়ে দিন।

এরপর পেস্তার সাথে পাটালি গুড় মেশান। মনে রাখবেন এই পাকটি ছানার পায়েসের মূল ম্যাজিক।

মিশ্রণটিকে দুধ ও ছানার সাথে মিশিয়ে দিন। উপরে পেস্তা গুঁড়ো দিয়ে পরিবেশন করুন।

রো
রোববার-এর
সহজপাঠ

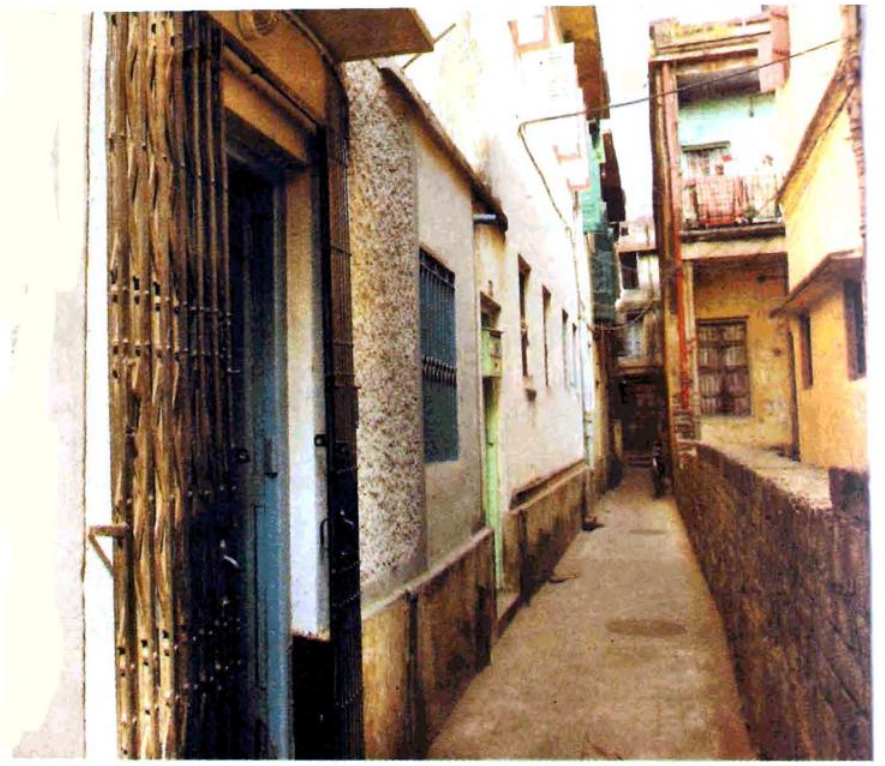

আবার ডোডো তাতাই

তারাপদ রায়

দিনকাল খুব ভাল নয়। চারদিকে নানারকম গোলমাল হচ্ছে। দাঙ্গা, ডাকাতি, লুঠপাট চারদিকে চলছে। শহরের মানুষেরা অবশ্য একটু নিরাপদ। কিন্তু কোথাও তেমন কোনও নিরাপত্তা নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আগের অবস্থা ফিরে আসেনি। ডোডাবাবু তাতাইবাবুদের বাবা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী সকলেই মনে মনে ভাবেন, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেন দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। চাপা গলায় বন্ধ ঘরের মধ্যে গুরুজনেরা কথাবার্তা বলেন। কে কবে পালিয়ে যাবেন, বলা যায় না। একদিন খুব সকালে দেখা যায় শূন্য বাড়ি, খালি উঠোনে পুরনো কুকুরটা শূন্য নয়নে বসে আছে।

মাঝে মাঝে ক্লাসে দেখা যেত একজনরা আসেনি, শোনা গেল শেষ রাতে কোথায় চলে গিয়েছে। তবে এ ধরনের ঘটনা পূর্ববঙ্গের দিকে বেশি ছিল। আত্মীয়স্বজন অধিকাংশই ওদিকে। দু-চারজন করে মামা, কাকা, পিসে এপারে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছেন। বিশেষত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ এবং সেই সঙ্গে এ পাশের পশ্চিমবঙ্গ— দুই পাশেই বাস করা গোলমেলে ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।

ডোডোবাবুর মাথাতেও ওই বয়সেও বাড়ি ছাড়ার নানান চিন্তা। কোথায় যেতে হবে? সে সব কেমন জায়গা? তাঁদের মা-বাবারা সেই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। সবাইকে নিয়ে নতুন করে বসবাস করার ব্যাপারটা ওইটুকু শিশু ডোডো কিংবা তাতাই-এর পক্ষে ভাবা কঠিন। কিন্তু সকলের সঙ্গে এই ভাবনা তার মাথায় ঢুকে গেল।

আজকাল ডোডোবাবু-তাতাইবাবু বাড়ির বাইরে খুব একটা যান না। বাড়িতে বারণ আছে। তাঁরা দু'জন চুপচাপ বসে ডোডোবাবুদের বাড়ির বারান্দায় এককোনায় খুব মনোযোগ দিয়ে ছবি আঁকেন, নকশা করেন।

এতগুলো সব দেশ যদি আরও ভেঙে যায় তবে তাঁরা কোথায় কীভাবে থাকবেন, তারই পরিকল্পনা।

তাতাইবাবুর ছোটবেলার পড়বার ঘরে খাটের নিচে একটি পুরনো ট্রাঙ্কে গাদা করে সেই নকশাগুলো রাখা আছে। এতদিন পরেও সেগুলো খুব নষ্ট হয়ে যায়নি। পোকায় কেটেছে। তা তো একটু কাটবেই।

এ বছর বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরে এসে তাতাইবাবু বললেন, "এবার পুরনো জিনিসপত্রগুলো একটু দেখব।" মা বললেন, "বিলেত আমেরিকা সারা পৃথিবী ঘুরে এসে এখন এই ট্রাঙ্ক খুঁজে পুরনো ছেঁড়া কাগজপত্র ঘাঁটবি নাকি? কিন্তু তাতাইবাবু ছাড়লেন না। ডোডোবাবুরা এখন পাশের বাড়িতে থাকেন না। তবুও খবর পেয়ে, তিনিও পরেরদিন বিকেলেই এলেন। তারপরে বারান্দায় ট্রাঙ্কটা খোলা হল। প্রথমে একটা হুইসিল। বহু স্মৃতিবিজড়িত হুইসিল দেখে দু'জনে চিনতে পারলেন। ডোডাবাবু ধুলো না ঝেড়েই হুইসিলটায় একটা ফুঁ দিলেন। এখনও চমৎকার আওয়াজ আছে। হুইসিলের শব্দে তাতাইবাবুর মা চলে এলেন। একটা মাথামোটা হুলো এল। এ হুলো এ বাড়ির অনেকদিনের। তার মানে এই নয় ছোটবেলার হুলো, এখনও রয়ে গিয়েছে। আগের হুলোটা তাতাইবাবুর বাঁশি শুনলেই চলে আসত। অনেকদিন আগেই তার জন্মান্তর হয়ে গিয়েছে।

ধীরে ধীরে বাক্স খোলা হল। কতরকম যে জিনিস বেরুলো। কুড়ি-পঁচিশটা বই ,খুব যত্ন করে রাখা। তাতাইবাবুদের বাল্য বয়েসের ফটো, ফেলুদা, ঘনাদার গল্পের বই। একটা বই হাতে তুলে নিলেন ডোডোবাবু। এ বইটা অবশ্য তাঁর নিজের। তাতাইবাবুর বাক্সে রয়ে গিয়েছে। লীলা মজুমদারের 'পদিপিসির বর্মীবাক্স।' তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিয়ে তাতাইবাবু পড়তে লাগলেন। ডোডোবাবু একটা পত্রিকা পেয়ে গেলেন যাতে পুরনো দিনের ডোডো তাতাইদের গল্প রয়েছে। হাসিমুখে নিজেদের পুরনো বই পুরনো দিনের মতো করে ডোডোবাবু তাতাইবাবু পড়তে লাগলেন।

Approach Roads & Bridges

Multi-product SEZ's

Several Small & Medium Scale Enterprises

Health, Education & Residential Developments

Over 17 lakh job opportunities

Coming Soon

NEW KOLKATA INTERNATIONAL DEVELOPMENT

A City of New Opportunities

For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.

unitech Dream. Believe. Create. | Satyam | USE Universal Success

22, Camac Street, Block-A, 4th Floor, Kolkata - 700 016. India Ph.: +91 33 2289 2000, 6450 2000 Fax: +91 33 2289 1530, +91 98319 53407
E-mail: kolkata@unitechgroup.com www.unitechgroup.com

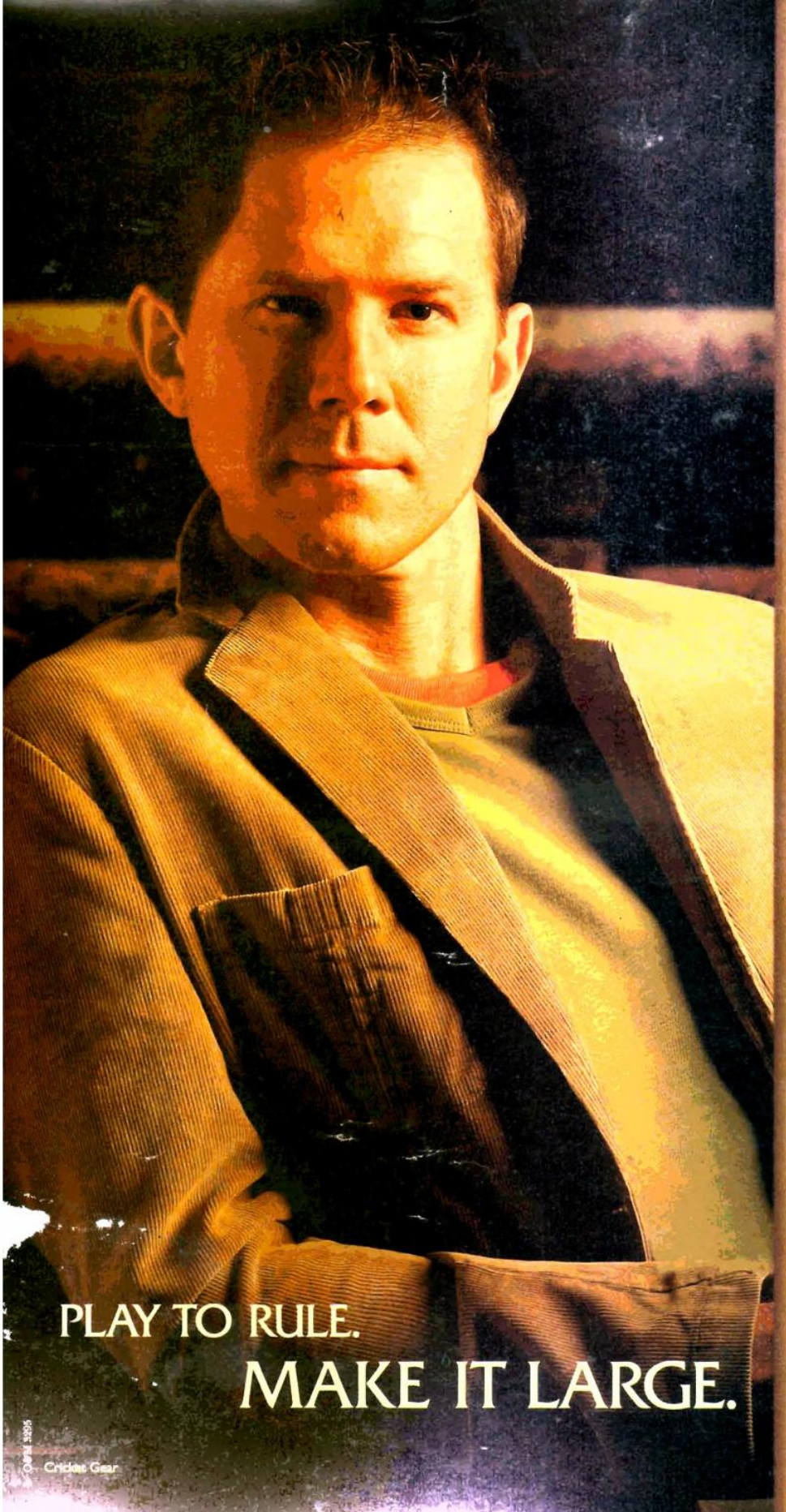

Seagram's

ROYAL STAG

Mens Cricket

Cricket Gear